হে প্রভু আমি উপস্থিত

সৈয়দ আলী আহসান

সৌজন্য সং

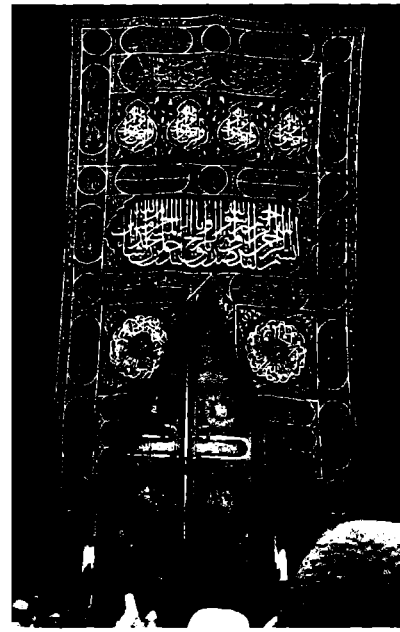

প্রভু আমি উপস্থি

সৈয়দ আলী আহসান

সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড

www.pathagar.com

হে প্রভু

www.pathagar.com

উপস্থিত

সৈয়দ আলী আহসান

www.pathagar.com

সপ ২৫ ভ ২/১

HE PROVU AMI UPOCHTHITH
A journny to Holy Kaaba by Professor Syed Ali Ahsan
Published by Srijan Prokashoni Limited, Dhaka
Revised Second Edition: April 1990
Price: Tk. 25.00 Only.

হে প্রভু আমি উপস্থিত ঃ সৈয়দ আলী আহসান ।। পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ বৈশাখ, ১৩৯৭ ।। প্রকাশক ঃ সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড ।। করিম চেম্বার (পঞ্চম তলা), ৯৯/ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ ।। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা ঃ মোমিন উদ্দীন খালেদ ।। মুদ্রক ঃ পেপার কনভার্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড, ৯৯/ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ ।। মূল্য ঃ পঁচিশ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

পারিবারিক গ্রন্থাগার

প্রাসঙ্গিকী

এই বইটি আমি অল্প সময়ের মধ্যে লিখে প্রকাশ করেছিলাম। মুদ্রণজনিত কিছু দ্রুততার কারণে পুস্তকের মধ্যে পরিচ্ছদ ভাগ এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ছাপা হয়নি। বর্তমান সংস্করণে সেই ত্রুটিগুলি সংশোধিত হল এবং কিছু অতিরিক্ত পাঠ সংযোজিত হল।

এ গ্রন্থের মধ্যে মিস্টার খান বলে একজন প্রকৌশলীর কথা আছে। পবিত্র নগরী দু'টিতে অবস্থানকালে তিনি আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। তিনি বর্তমানে পরলোক গমন করেছেন। আমি তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ বর্তমানে কেমব্রীজে স্থায়ী বসবাস করছেন। তারই ব্যবস্থাপনায় মক্কা ও মদিনাতে আমার অবস্থান সুস্থ হয়েছিল।

কল্যাণীয় বুলবুল সরওয়ার এ গ্রন্থ লেখায় আমাকে সর্বদা উৎসাহিত করেছেন। জীবন ক্ষেত্রে আমি তার সমৃদ্ধি কামনা করি।

৬০/১, উত্তর ধানমণ্ডি
ঢাকা-১২০৫

—*সৈয়দ আলী আহসান*

www.pathagar.com

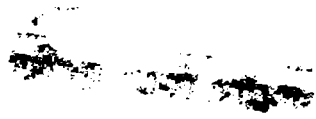

প্রকাশকের নিবেদন

হজ্জও উমরাহ্‌কে কেন্দ্র করে কাবাগৃহ তাওয়াফ সারা বিশ্বের মানুষের কাছে একটি পরিচিত বিষয় । প্রতিদিন, প্রতিবছর অসংখ্য মানুষ পবিত্র নগরীতে সমবেত হচ্ছে একটি মাত্র লক্ষ্যকে সামনে রেখে, আর তা হচ্ছে খোদার সন্তুষ্টি । পৃথিবীর আর কোন ধর্মেই এমন কেন্দ্রাভিমুখী কোন পরিক্রমণ আছে বলে আমাদের জানা নেই । এ অনুষ্ঠান একই সাথে একক ও অনন্য ।

হজ্জও পবিত্রভূমি ভ্রমণকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বহুভাষায় অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হয়েছে । বাংলা ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয় । কিন্তু এ সব বইয়ের কোনটিতে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা আবার কোনটিতে পথযাত্রার বিস্তারিত বিবরণই মুখ্য । কেউ কেউ সমন্বিতভাবেও লিখেছেন, কিন্তু সাহিত্য বিবেচনায় তা তেমন হৃদয়গ্রাহী হয় নি । এ বইটি এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম । পরিসর সংক্ষিপ্ত রেখেও যে শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্মিত হতে পারে, জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান আরেকবার তা প্রমাণ করে দেখালেন ।

বইটির উত্তরোত্তর পাঠকপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ থাকলেই আমরা কৃতার্থ ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইক

www.pathagar.com

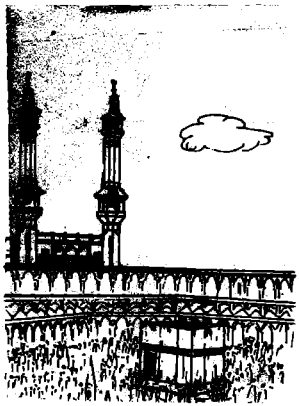

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের অনেকদিন পর্যন্ত কোনো সন্তান ছিল না, সন্তান জন্ম নেবার কোনো ভরসাও ছিল না। এক রাত্রিতে আল্লার নির্দেশে তিনি তাঁর তাঁবুর বাইরে এলেন এবং আকাশের দিকে তাকালেন। সে সময় দৈববাণী হলঃ *তুমি আকাশের দিকে তাকাও এবং নক্ষত্রগুলো গণনা করবার চেষ্টা করো। দেখো গণনা করা যায় কিনা।*

ইব্রাহীম আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তখন আবার দৈববাণী হলঃ আকাশের অগণিত নক্ষত্রের মতোই তোমার বংশপরম্পরা গড়ে উঠবে।

হযরত ইব্রাহীমের স্ত্রী বিবি সারাহ তখন বৃদ্ধা। ইব্রাহীমেরও বয়স অনেক। সারাহর সন্তান সম্ভাবনা ছিল না। সারাহ তাই তাঁর মিশর দেশীয় যুবতী পরিচারিকা হাজেরাকে ইব্রাহীমের হাতে সমর্পণ করলেন। ইব্রাহীম হাজেরাকে বিয়ে করলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই হাজেরা ও সারাহর মধ্যে তিক্ততা গড়ে উঠলো এবং হাজেরা গোপনে আল্লার কাছে তাঁর বেদনা এবং আর্তনাদ নিবেদন করলেন। আল্লার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা হাজেরার কাছে আল্লার বাণী নিবেদন করলেন, *তোমার আর্ত আবেদন আল্লাতায়ালা শুনেছেন। তিনি বিপুলভাবে তোমার বংশ বৃদ্ধি করবেন। তুমি সন্তানবতী হবে। সে সন্তানের নাম রাখবে ইসমাইল।*

হাজেরা ফেরেশতার কাছে এই সংবাদ পেয়ে ইব্রাহীম ও সারাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁদেরকে এ সংবাদ জানান। হাজেরা এক পুত্র সন্তান লাভ করেন এবং ইব্রাহীম তাঁর নাম রাখেন ইসমাইল যার অর্থ হচ্ছে "আল্লাহ শ্রবণ করবেন"।

যখন ইসমাইলের বয়স ১৩, ইব্রাহীমের বয়স তখন ১০০ এবং সারাহর ৯০ বৎসর। সে সময় আল্লাহ আবার ইব্রাহীমকে ডেকে বললেন, *সারাহরও এক সন্তান হবে এবং তাঁর নাম রাখবে ইসহাক।*

ইব্রাহীম ভয় পেলেন যে, সম্ভবত সারাহর সন্তান জন্মগ্রহণ করলে ইসমাইল আল্লার রহমত লাভে বঞ্চিত হবে। তিনি তাই আল্লার কাছে প্রার্থনা করলেন, *হে আল্লাহ, ইসমাইল যেন তোমার কাছে সতত বিদ্যমান থাকে।*

আল্লাহ তখন ইব্রাহীমকে বললেন, ইসমাইলের জন্য চিন্তা করো না, আমি তাকে অভিনন্দিত করেছি। তার মাধ্যমে এক বিরাট জাতি গড়ে উঠবে। কিন্তু ইসহাকের মাধ্যমে পৃথিবীতে আমি আমার বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত রাখতে চাই। আগামী বছর নির্দিষ্ট সময়ে সারাহ ইসহাককে জন্ম দেবে।

www.pathagar.com

ইসহাকের জন্মের পর সারাহ ইসহাককে লালন করতে লাগলেন। শিশু ইসহাক যখন একটু বড় হয়েছে তখন সারাহ ইব্রাহীমকে বললেন যে, হাজেরা তার সন্তান নিয়ে এ গৃহে আর থাকতে পারবে না। এ কথায় ইব্রাহীম খুব দুঃখ পেলেন। কেননা ইসমাইলকে তিনি খুবই ভালোবাসতেন। আল্লাহ আবার তাঁকে নির্দেশ দিলেন সারাহর কথা মান্য করতে। আবার তিনি বললেন যে, ইসমাইলের প্রতি তাঁর কল্যাণ রয়েছে।

এভাবে ইব্রাহীমের সূত্র থেকে দুটি মহৎ জাতি গড়ে ওঠে। একটি ইসমাইলকে অবলম্বন করে, আর একটি ইসহাককে অবলম্বন করে। আল্লাতায়ালা তাঁর মহত্ত্ব এবং বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এ দুটি জাতির গোড়াপত্তন করলেন। এভাবে ইব্রাহীম আল্লার অশেষ কৃপার প্রস্রবণী হলেন। একটি কৃপা প্রকাশিত হল ইসমাইলকে কেন্দ্র করে, অন্যটি প্রকাশিত হল ইসহাককে কেন্দ্র করে। ইব্রাহীম আল্লার নির্দেশ পালন করলেন এবং হাজেরা ও ইসমাইলকে আল্লার আশীবাদের কাছে অর্পণ করলেন।

ইব্রাহীম যেখানে ছিলেন সেখানকার ভূমি পবিত্র ছিল। কিন্তু আর একটি পবিত্র ভূমি ছিল যে ভূমির কথা ইব্রাহীম জানতেন না। এই ভূমির পথে হাজেরা ও ইসমাইলকে নিয়ে ইব্রাহীম পরিচালিত হলেন। ভূমিটি ছিল আরব দেশের একটি উষর অঞ্চল। কানান থেকে ৪০ উটের দিবসে অবস্থিত।

তিনি বেকা নামক একটি সরু উপত্যকায় হাজেরাকে পুত্রসহ রেখে এলেন। এই উপত্যকার চতুর্দিকে পাহাড় ছিল এবং উপত্যকা থেকে বেরিয়ে আসার তিনটি পার্বত্য পথ ছিল যার একটি পথ ছিল উত্তরের দিকে, একটি দক্ষিণের দিকে। কি করে ইব্রাহীম হাজেরা এবং ইসমাইলকে নিয়ে বেকা উপত্যকায় পৌছেছিলেন তা আমরা জানি না। কিন্তু যেহেতু চিরদিন আরবের উটের কাফেলা এই পথ দিয়ে দক্ষিণাঞ্চল থেকে ভূমধ্যসাগরের দিকে যেত, সে কারণেই সম্ভবত এই পথ ধরেই হাজেরা ও ইসমাইলকে ইব্রাহীম বেকা উপত্যকায় রেখে এসেছিলেন। সেখানে তাদেরকে নিঃসঙ্গ রেখে ইব্রাহীম সারাহর কাছে ফিরে যান।

এখানে অবস্থানকালে এক পর্যায়ে ইসমাইল তৃষ্ণায় মরণাপন্ন হন। হাজেরা তখন পানির সন্ধানে দুটি অনুচ্চ পর্বত শিখরে বারবার উঠে পানির অনুসন্ধান করছিলেন। সম্ভবত চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে কোনো কাফেলা লক্ষ্যগোচর হয় কিনা তাও তিনি দেখছিলেন। এভাবে সাতবার তিনি একটি পর্বত শিখর থেকে আর একটি পর্বত শিখরে দৌড়ে যান। এ দুটি পাহাড় চূড়ার নাম হচ্ছে সাফা এবং মারওয়া। সপ্তমবার দৌড়ে আসার পর হাজেরা যখন ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন তখন তিনি আল্লার বাণী শুনতে পেলেনঃ *হাজেরা তুমি ভয় পেও না। তোমার সন্তান যেখানে আছে সেখান থেকে তুমি দূরে দাঁড়াও। আমি তোমার সন্তানের মাধ্যমে বিরাট একটি জাতি সৃষ্টি করব।*

হাজেরা দৌড়ে গিয়ে দেখেন যে, ইসমাইলের পায়ের গোড়ালির কাছ থেকে পানির নহর প্রবাহিত হচ্ছে। এ নহরই জমজমের উৎস। অল্প সময়ের মধ্যেই একটি কাফেলা এ পথ দিয়ে

www.pathagar.com

যাওয়ার সময় এই প্রস্রবণের তীরে হাজেরা ও ইসমাইলকে দেখতে পান। এভাবে ক্রমশ প্রস্রবণটিকে কেন্দ্র করে একটি বিরাট জনপদ গড়ে ওঠে এবং সকল প্রকার কাফেলার বিশ্রাম এবং অবস্থানকেন্দ্রে পরিণত হয়।

এর পরে বাইবেলে ইসহাকের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসমাইলের কোনো কাহিনী বর্ণিত হয়নি। ইসমাইল সম্পর্কে বাইবেলের জেনেসিস গ্রন্থে বলা হয়েছে, "...এবং আল্লাহ বালকের সঙ্গে ছিলেন এবং তরুণ বালকটি ক্রমশ বয়ঃপ্রাপ্ত হয় এবং জনপদহীন অঞ্চলে শক্তিমান ধনুর্ধর হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।" এরপর বাইবেলে ইসমাইলের নাম একবার মাত্র এসেছে যেখানে বলা হয়েছে যে, ইব্রাহীমের মৃত্যুর পর দুই ভ্রাতা ইসমাইল এবং ইসহাক তাঁদের পিতাকে হেবরন অঞ্চলে সমাহিত করে।

পবিত্র কোরান শরীফে হযরত ইব্রাহীম এবং হযরত ইসমাইলের কাহিনী বর্ণিত আছে। যখন জমজম কূপ প্রকাশ পেল এবং সেই কূপকে কেন্দ্র করে একটি জনপদ গড়ে উঠল তখন ইব্রাহীম সেখানে আবার এলেন। সেখানে তিনি নির্দেশ পেলেন যে, জমজম কূপের নিকটে আল্লার একটি গৃহ নির্মাণ করতে হবে। পিতা এবং পুত্র উভয়ে মিলিতভাবে এই গৃহ নির্মাণ করলেন। কি করে এই গৃহ নির্মাণ করতে হবে তার নির্দেশ তাঁরা আল্লার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এই গৃহের নাম রাখা হয় 'কাবা'।

পবিত্র কাবা ঘরটি চতুষ্কৌণিক। কাবা গৃহের এক কোণে একটি পবিত্র পাথর স্থাপিত আছে। এই প্রস্তরখন্ডটি আবু কুবায়েস পর্বতের ওপর থেকে হযরত ইব্রাহীমকে একজন ফেরেস্তা এনে দেন। প্রস্তরখন্ডটি পৃথিবীর নয়। এটি আল্লার নির্দেশে আকাশ থেকে আবু কুবায়েস পর্বতের উপর পতিত হয়েছিল। কোরান শরীফে বলা হয়েছে যে, দুগ্ধশুভ্র এই প্রস্তরখন্ডটি আকাশ থেকে ভূতলে পতিত হয়েছিল। কিন্তু পাপভারে পীড়িত মানুষের চুম্বনে প্রস্তরখন্ডটি ক্রমশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। কাবা গৃহের নির্মাণ কাজ যখন সমাপ্ত হয় তখন এর পূর্বকোণে এই প্রস্তরখন্ডটি স্থাপন করা হয়। তখন আল্লাতায়ালা ইব্রাহীমকে নির্দেশ দেন, *আমার গৃহকে তাদের জন্য পবিত্র কর যারা এর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করবে, যারা এর সামনে মস্তক নত করবে এবং যারা সেজদা দেবে। সকল মানুষের কাছে হজ্জব্রত পালনের ঘোষণা দাও, যেন তারা পায়ে হেঁটে এখানে আসে অথবা উটের পৃষ্ঠে পর্বত ও উপত্যকা অতিক্রম করে।*

হাজেরা ইব্রাহীমকে বলেছিলেন কি করে সাহায্যের সন্ধানে তিনি সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত এবং পুনরায় মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত সাতবার দৌড়ে গিয়েছিলেন। এই স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য হযরত ইব্রাহীম নির্দেশ দেন যে, যারা হজ্বব্রত পালন করবে তারা কাবা গৃহ প্রদক্ষিণের পর সাতবার সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে সাফায় সাতবার দৌড়ে যাবে। এই পথযাত্রাকে 'সাঈ' বলে।

ইব্রাহীম ছিলেন সত্যানুসন্ধানী এবং সত্য সাধক। সুস্পষ্টভাবে ইসলাম ধর্মের কার্যক্রমের গণনা আমরা ইব্রাহীম থেকেই করে থাকি। ইব্রাহীমের পিতা আজর ছিলেন মূর্তিপূজক এবং

www.pathagar.com

তাঁর ব্যবসা ছিল মূর্তি নির্মাণ। আজর নিয়মিত মূর্তি নির্মাণ করতেন এবং দক্ষ মূর্তিনির্মাতা হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। শৈশব থেকেই ইব্রাহীম মূর্তিপূজার প্রতি বিরূপ ছিলেন। শৈশবেই তাঁর মনের মধ্যে চিন্তা জাগে যে, মানুষের হাতের তৈরী মাটির পুতুল কি করে মানুষকে কল্যাণ প্রদানের অধিকারী হয়। এই জিজ্ঞাসায় ক্রমশ ইব্রাহীম তাঁর পিতৃপুরুষদের পূজার্চনা বিধির প্রতি বিরূপ হয়ে পড়েন। একবার উৎসবের দিনে ইব্রাহীমের পিতা আজর পুত্রকে মূর্তিঘরের প্রহরায় রেখে নিজে উৎসবে যোগদান করেন। পিতার অনুপস্থিতিতে ইব্রাহীম কুঠার দিয়ে মূর্তিগুলোকে ভাঙ্গচুর করেন এবং সর্বাপেক্ষা বৃহৎ আকৃতির মূর্তির ঘাড়ে কুঠারটি ঝুলিয়ে রেখে পিতার অপেক্ষা করতে থাকেন।

পিতা এসে তাঁর মূর্তিগুলোর এই ধ্বংস দেখে হাহাকার করে ওঠেন এবং ইব্রাহীমকে ঐ অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করেন। ইব্রাহীম পিতাকে সংক্ষেপে বলেন, যে মূর্তির ঘাড়ে কুঠারটি রয়েছে তাকেই জিজ্ঞেস করুন।

আজর উত্তরে বলেন, মূর্তির কি প্রাণ আছে যে সে কথা বলতে পারবে?

ইব্রাহীম তখন পিতাকে প্রশ্ন করেন, যার প্রাণ নেই, সে কি করে মানুষকে সৌভাগ্য দান করতে পারে এবং মানুষের জন্য কল্যাণ-অকল্যাণ প্রদান করতে পারে? এরপর ইব্রাহীম তাঁর পিতাকে অনুনয় করলেন তাঁর পিতা যেন মূর্তিপূজা ছেড়ে দেন। কিন্তু আজর তার পিতৃপুরুষের প্রথা ছেড়ে দিতে রাজী হলেন না।

ইব্রাহীম বহুবিধ জিজ্ঞাসা এবং পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সত্যকে আবিষ্কার করেছিলেন এবং বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যখন রাত্রিবেলা আকাশে চাঁদ দেখা গিয়েছিল এবং চাঁদের আলোতে পৃথিবী উদ্ভাসিত হয়েছিল, তখন তিনি মনে করেছিলেন, এই চাঁদই বিশ্বপ্রভু। কিন্তু চাঁদ যখন অস্তমিত হল তখন তিনি ভাবলেন, যে বস্তু অন্তরালে যায়, দৃষ্টির আড়ালে যায়, সে কি করে বিশ্বপ্রভু হতে পারে?

দিবসে বিরাট দীপ্যমান সূর্য যখন তাঁর দৃষ্টিতে পড়ল তখন তিনি ভাবলেন, সূর্যই বিশ্বনিয়ন্তা। কেননা এত বিরাট আর এত উজ্জ্বল আর তো কিছু হতে পারে না। কিন্তু সূর্য যখন সন্ধ্যাকালে অস্তমিত হল তখন তিনি ভাবলেন যে, সূর্য বিশ্বনিয়ন্তা হতে পারে না। বিশ্বনিয়ন্তা হচ্ছেন তিনি যিনি চন্দ্র-সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নির্মাণ করেছেন। বিশ্বনিয়ন্তা তিনি, যাঁর নির্দেশে দিবারাত্রি পরিক্রমা চলে, সূর্য-চন্দ্রের আবর্তন ঘটে। এভাবে ইব্রাহীম সত্যকে আবিষ্কার করেছিলেন। মহান আল্লার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিজের চেতনাকে জাগ্রত করেছিলেন এবং বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছিলেন। এই বিশ্বাসই হচ্ছে ইসলাম ধর্মের উৎস।

আল্লাতায়ালা ইব্রাহীমের সত্য আবিষ্কারের ঘটনাটি নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেনঃ

স্মরণ করো, ইব্রাহীম তার পিতা আজরকে বলেছিল, আপনি কি মূর্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি। এভাবে আমরা ইব্রাহীমকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন-ব্যবস্থা দেখাই যাতে সে নিশ্চিত

www.pathagar.com

বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর রাতের অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল তখন সে নক্ষত্র দেখে বলল, 'ঐটিই আমার প্রতিপালক।' অতঃপর যখন ঐটি অস্তমিত হল তখন সে বলল, 'যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না।' অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে উদিত হতে দেখল তখন সে বলল, এটি আমার প্রতিপালক।" যখন সেটি অস্তমিত হল তখন সে বলল, 'আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হব।' অতপর যখন সে সূর্যকে উদিত হতে দেখল তখন সে বলল, 'এটি আমার মহান প্রতিপালক।' যখন সেটিও অস্তমিত হল তখন সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহর অংশী কর, তা থেকে আমি নির্লিপ্ত। নিশ্চয়ই আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফেরাচ্ছি যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।' তাঁর সম্প্রদায় তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হল। সে বলল, 'তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হবে? তিনি তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। আমার প্রতিপালক অন্যবিধ ইচ্ছা না করলে তোমরা যাকে তাঁর অংশী কর তাকে আমি ভয় করি না। সবকিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত, তবু কি তোমরা অনুধাবন করবে না? তোমরা যাকে আল্লার অংশী কর আমি তাকে কিরূপে ভয় করব? যে বিষয়ে তিনি তোমাদের কোনো সনদ দেননি তাকে তোমরা আল্লার অংশী করতে ভয় কর না। সুতরাং যদি তোমরা জান তবে বলো দু'দলের মধ্যে কোন দল নিরাপত্তা লাভের অধিকারী ? যারা বিশ্বাস করেছে এবং তাদের বিশ্বাসকে (অংশীস্থাপন দ্বারা) কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথ প্রাপ্ত।' এবং এ আমার যুক্তি যা ইব্রাহীমকে তার সম্প্রদায়ের সাথে মুকাবিলা করতে দিয়েছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নত করি, তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময় জ্ঞানী। এবং তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তাদেরক সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম।

কোরান শরীফে ইব্রাহীমের বিবরণ আরো আছে। পিতা আজরকে প্রতিমা পূজা থেকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য যে চেষ্টা তিনি করেছিলেন তার বিবরণ নিম্নরূপে দেওয়া আছেঃ

সে যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা কিসের উপাসনা কর?' ওরা বলল, 'আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সাথে ওদের পূজায় নিরত থাকব।' সে বলল, 'তোমরা আহ্বান করলে ওরা কি শোনে অথবা ওরা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করতে পারে?' ওরা বলল, 'না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এরূপ করতে দেখেছি।' তোমরা কি যার পূজা করছ তার সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ? তোমরা এবং তোমাদের অতীত পিতৃপুরুষেরা যার পূজা করত? বিশ্বজগতের প্রতিপালক ব্যতীত তারা সকলেই আমার শত্রু; তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। তিনি আমাকে আহার্য ও পানীয় দান করেন। এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনর্জীবিত করবেন। এবং আশা করি তিনি কিয়ামতের দিন আমার অপরাধসমূহ মার্জনা করে দেবেন। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান কর

www.pathagar.com

এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর। আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী কর এবং আমাকে সুখকর উদ্যানের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত কর। আর আমার পিতাকে ক্ষমা কর, তিনি তো পথভ্রষ্ট। এবং আমাকে পুনরুত্থান দিবসে লাঞ্ছিত করো না। যেদিন ধনসম্পদ ও সন্তান–সন্ততি কোনো কাজে আসবে না, সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লার নিকট বিশুদ্ধ অন্তকরণ নিয়ে আসবে। জান্নাত সাবধানীদের নিকটবর্তী করা হবে এবং পথভ্রষ্টদের জন্য উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম। ওদের বলা হবে, 'তারা কোথায়, আল্লাহর পরিবর্তে যাদের তোমরা উপাসনা করতে? ওরা কি তোমাদের সাহায্য করতে আসবে? না ওরা আত্মরক্ষা করতে সক্ষম?' অতঃপর ওদের এবং পথভ্রষ্টদের অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং ইবলীসের বাহিনীর সকলকেও। ওরা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে, 'আল্লার শপথ ! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম, যখন আমরা তোমাদের বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করতাম। আমাদেরকে দুষ্কৃতিকারীরা বিভ্রান্ত করেছিল। পরিণামে আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই। এবং কোনো সহৃদয় বন্ধুও নেই। হায়, যদি আমাদের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটতো তাহলে আমরা বিশ্বাসী হয়ে যেতাম।' এতে অবশ্যই নির্দশন রয়েছে কিন্তু ওদের অধিকাংশ বিশ্বাসী নয়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

হযরত ইব্রাহীম বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লার নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর সেই বিশুদ্ধতা এবং পবিত্রতা থেকে আমরা ইসলামের ধারাক্রম গণনা করি। ইব্রাহীম যখন তাঁর সত্য প্রচার কাজে নিযুক্ত তখন অভিশপ্ত নৃপতি নমরুদ তাঁর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেছিল। যখন ইব্রাহীম মূর্তি ধ্বংস করেছিলেন এবং নমরূদের লোকজনকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "তোমরা নিজেরা যেগুলোকে খোদাই করে নির্মাণ করছ সেগুলোকেই কি তোমরা পূজা কর? প্রকৃতপক্ষে আল্লাই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা সৃষ্টি করছ তাও আল্লারই সৃষ্টি।" তখন তারা অগ্নিকুন্ড তৈরী করে তাতে ইব্রাহীমকে নিক্ষেপ করেছিল। অগ্নিকুন্ড তাঁকে দহন করল না। ইব্রাহীম নির্বিঘ্নে অগ্নিকুন্ড থেকে বেরিয়ে এলেন।

নমরুদের সঙ্গে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হবার আগে ইব্রাহীম একটি কথপোকথনে লিপ্ত হয়েছিলেন। ইব্রাহীম নমরুদকে বলেছিলেন, "তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান।"

নমরুদ উত্তরে বলেছিল, "আমিও তো জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই।"

ইব্রাহীম তখন বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদয় করান। তুমি যদি পার তাকে পশ্চিমে দিক থেকে উদয় করাও।"

ইব্রাহীমের উত্তর শুনে নমরুদ হতভম্ব হয়ে গেল। কিন্তু সৎপথে পরিচালিত হল না।

এরপর হাজেরার গর্ভে ইসমাইল জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশেই আমাদের প্রিয়তম নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মানুষের সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তির শাশ্বত বাণী নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন।

www.pathagar.com

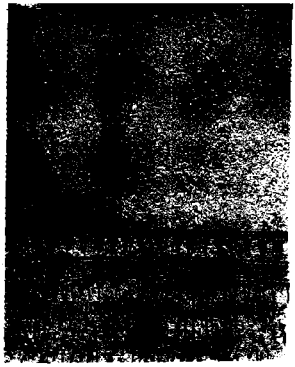

আমার জীবনে কখনো কাবা গৃহ দর্শন, তাওয়াফ এবং সাঈ করা সম্ভবপর হবে বলে আমি ধারণা করিনি। শুধু এর বিবরণ শুনেছি বিভিন্ন লোকের মুখে, চিত্রদর্শন করেছি এবং সাম্প্রতিককালে টেলিভিশনে হজ্জের দৃশ্যমান উপকরণ এবং ঘটনাগুলো দেখেছি। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের মতো পবিত্র কাবা আমার কাছে একটি পরিচিত জায়গা। আমি আমার মনের মুকুরে কাবার একটি চিত্র প্রতিফলিত করে রেখেছিলাম। কিন্তু প্রত্যক্ষে কাবাগৃহের সম্মুখে এসে মনে হল ছবিতে যা দেখেছি এবং মানুষের মুখে যা শুনেছি তার কোনোটাই সাক্ষাৎ দর্শনের মতো নয়। সাক্ষাৎ দর্শনটি একটি বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। তখন মনে হল আমি অনন্তকে স্পর্শ করছি, একটি সর্বকালীন প্রত্যাশাকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করছি, একটি বিশিষ্ট জাগরণের মধ্যে জাগরিত হচ্ছি, একটি বিশ্বাসের নিগূঢ়তায় নতুন একটি চৈতন্যের মধ্যে আপনাকে স্থাপিত দেখছি। এই অভিজ্ঞতার তুলনা নেই, এই অভিজ্ঞতা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মনে হয় আমি আমার সর্বকালের আকাংখিত সৌন্দর্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছি। একটি অপরিসীম স্নিগ্ধতায়, একটি অনিবার্য মোহনীয়তায় আমি আচ্ছন্ন হচ্ছি। কাবা গৃহের চর্তুদিকে সময়ের কোনো বন্ধন নেই। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে এবং এভাবে যুগ যুগ ধরে মানুষের বিরামহীন পরিক্রমা চলছে–যার আরম্ভ নেই, শেষও নেই।

বিভিন্ন মুহূর্তে দেখেছি, কাবা গৃহের চতুর্দিকে মানুষ ঘুরে ঘুরে চলেছে। কত দেশের মানুষ, কত ভাষার মানুষ, কত বিবিধ আচরণের মানুষ –একটি মাত্র বিশ্বাসের সচলতায় কাবাকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। সকলেই বলছে, *হে আমার প্রভু, আমি তোমার দাসানুদাস, আমি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি। আমাকে সকল গ্লানি থেকে মুক্ত করো, আমাকে আমার ইচ্ছা–অনিচ্ছার এবং সকল কর্মের পাপ থেকে মুক্ত করো, আমাকে পরিচ্ছন্ন এবং জ্যোতির্ময় করো।*

ক্রন্দনে আকুল অযুত–নিযুত কণ্ঠ প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে এই একই কথা বলে চলেছে।

আমি ভেবেছিলাম, কখনো হয়তো আমি মক্কা শরীফে যেতে পারব না। শারীরিক অসুস্থতা আমার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু যখন মিশরে যাবার আমন্ত্রণ পেলাম তখন ভাবলাম, মিশর থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে যদি ওমরাহ হজ্জ করে আসতে পারি তবেই আমি মিশরে যাবো। ৬ই মার্চ আমি করাচী থেকে মিশরীয় বিমানে কায়রো পৌঁছলাম। তার আগে ঢাকা থেকে পি আই এ'র বিমানে তিন তারিখে করাচীতে যেতে হয়েছিল এবং করাচীতে তিন দিন

www.pathagar.com

ছিলাম। করাচী আমার পুরনো পরিচিত জায়গা। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত আমি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলাম। কিন্তু এখন সে করাচী আর নেই। অজস্র অট্টালিকাশ্রেণী করাচী শহরকে একটি কর্মমুখর জনপদে পরিণত করেছে। বিভিন্ন ধরনের বাসপোযোগী গৃহ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সমন্বিত হয়ে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। লাহোর অথবা দিল্লীর যেমন একটি নিজস্ব সত্তা আছে, করাচীর সে রকম নেই। করাচী বহু পূর্ব থেকেই ব্রিটিশ প্রশাসনের একটি কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। করাচীর ইমারতগুলো তাই কোনো বিশেষ আঞ্চলিক উচ্চারণকে প্রকাশ করে না। আন্তর্জাতিক মানের হোটেল, হাইওয়ে, বহুতলবিশিষ্ট অট্টালিকা, পণ্য বিক্রয়কেন্দ্র–এর সমস্ত কিছু যে কোনো আন্তর্জাতিক শহরের সমতুল্য। আমি করাচী অবস্থান কালে আমার পরিচিত পুরনো করাচীকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সফলকাম হইনি। আমার সময়কার পরিচিত বন্ধুবান্ধব অনেকেই এখন নেই। যে দু' একজন ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে আমাকে একটি সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল ইন্টারকন্টিনেন্ট হোটেলে। সেখানে দু'একজন পুরনো বন্ধু এসেছিলেন, যেমন করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জামিল জালিবি, কায়েদে আযম ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর জেনারেল শরীফ আল মুজাহিদ এবং উর্দু ডেভলেপমন্টে বোর্ডের এক সময়কার প্রধান শানুল হক হক্কী। বেগম জেবুন্নেসা হামিদুল্লাহর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছি, দেখা করতে পারিনি। বেগম জেবুন্নেসা এস ওয়াজেদ আলীর কন্যা। বর্তমানে বয়স সত্তরের উর্ধ্বে। এক সময় 'মিরর' নামক একটি পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। টেলিফোনে জানতে চাইলেন আমরা বাংলাদেশে তাঁর পিতার গ্রন্থাদির প্রকাশ এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিয়েছি কিনা। তিনি তাঁর নিজের জীবনের কথা বললেন। স্বামীর মৃত্যুর পর একটি অসহায় নির্জনতায় তিনি সময় কাটাচ্ছেন। ১৯৬২ সালে বেগম জেবুন্নেসাকে আমি প্যারিসে সাঁজালিজের পথে দেখি। আমি রাত্রি বেলা সাঁজালিজের ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছিলাম এবং রাস্তার পাশের আলোকিত বিপণি শোভা দেখছিলাম। সে সময় হঠাৎ বিপরীত দিক থেকে স্বামীসহ বেগম জেবুন্নেসাকে দেখি। তারপর আমরা একটি চায়ের দোকানে বসে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলাম। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং রুচিবান মহিলা। হাতের কব্জিবন্ধ পর্যন্ত আবৃত ফুলহাতা ব্লাউজ পরতেন। শাড়ী তাঁর শরীরের একটি সৌজন্যের আবরণ দিত। অথচ তিনি ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিতা এবং এক ইংরেজ রমণীর কন্যা। নাজিমাবাদে আমার বাসায় অনেকবার এসেছেন। তাঁর মুখে শুনলাম, শিল্পী সাদেকাইন মারা গিয়েছেন। তিনি বললেন, যারা সুন্দর তারাই চলে যায়। যাদের কিছু দেবার থাকে তারাই তাদের সবটা দিতে পারে না। এদিকে পৃথিবী ঘাতকদের অধিকারে থাকে। তিনি মানসিকভাবে আহত এবং ক্ষুব্ধ ছিলেন, তাই তাঁর কথার প্রতিবাদ করলাম না।

করাচীতে যাদের বাসায় ছিলাম তারা অত্যন্ত ভদ্র এবং সজ্জন। গৃহের পরিচালনা এবং আচরণ বিধি অত্যন্ত শৃংখলার। একান্নবর্তী পরিবার। গৃহকর্তা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একজন ধর্মপ্রাণ বলিষ্ঠ পুরুষ। বয়স সত্তরের উর্ধ্বে। স্বল্পবাক এবং পরিচ্ছন্ন স্বভাবের এই ব্যক্তি অধিকাংশ

www.pathagar.com

সময় মসজিদেই কাটান, আবার তিনিই গৃহের কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর বড় ছেলে একটি কারখানার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাকিস্তান বিমানের প্রধান প্রকৌশলী। কনিষ্ঠ ভ্রাতার এক পুত্র পাকিস্তানের জুনিয়র স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়ন। বাড়ির অভ্যন্তরের মহিলারা অত্যন্ত শান্ত নির্জনতায় বাস করেন। এই গৃহে যে ক'দিন ছিলাম সে ক'দিন আমাদের আপ্যায়নের কোনো ত্রুটিই হয়নি। বরঞ্চ এতো নিখুঁত ছিল যে, আমার কাছে শ্বাসরুদ্ধকর মনে হয়েছিল। এক প্রকার যান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতায় বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হত। সারা দুপুর এমন কি সন্ধ্যার পরও বাড়িটি অদ্ভুত শান্ত মনে হত। কোথাও কোনো সাড়া শব্দ ছিল না। শুধু যেদিন আমরা খুব সকালে গৃহত্যাগ করে কায়রো যাবো বলে বিমান বন্দরের দিকে রওয়ানা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, তখন কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং কিছুক্ষণ আন্তরিকভাবে কথাবার্তা বললেন। তাঁর কথাবার্তার মধ্যে অসম্ভব সৌজন্য ছিল। বিনয় ছিল। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হল কিছুটা অসহায়তা ও দুঃখও ছিল। এই গৃহের অপূর্ব শৃংখলা এবং নিস্তব্ধতা ভদ্রমহিলাকে কেমন যেন স্তব্ধ করে দিয়েছে বলে আমার মনে হল। এই গৃহের বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলবার নেই। কেননা আপ্যায়নের দিক থেকে একটি পরিপূর্ণতা আমরা পেয়েছি। কিন্তু যে জিনিসটা পাইনি, তা হচ্ছে এক প্রকার অকুণ্ঠ সহজতা। আমি এটাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না। আমাদের কোনো আত্মীয় ছিল না। দু'টি ছোট বেড়াল ছিল। বেড়াল দুটি ঘরের বাইরে আঙ্গিনায় ঘোরাফেরা করত। আমি কোনো কোনো সময় আঙ্গিনায় নেমে বেড়াল দু'টির সঙ্গে খেলা করবার চেষ্টা করতাম।

আর একটি ঘটনার কথা এখানে বলা প্রয়োজন বোধ করছি। কায়রো থেকে আমাদের টিকেট আসার কথা ছিল ইজিপ্ট এয়ার লাইসেন্স অফিসে। কিন্তু ইজিপ্ট এয়ার লাইনস সে মর্মে কায়রো থেকে কোনো নির্দেশ পায়নি। সুতরাং তারা আমাদের আমন্ত্রণপত্র দেখেও টিকেট দেয়নি। কায়রোতে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম কিন্তু তারও কোনো উত্তর ৫ তারিখের মধ্যে পাইনি। সে সময় আমার পূর্ব পরিচিত সুজাউদ্দৌলা নামে এক ভদ্রলোক আমাদের অসুবিধার কথা শুনে আমার এবং আমার ভাই আলী নকীর কায়রো এবং কায়রো থেকে প্রত্যাবর্তনের দু'টি টিকেট কিনে দেন। ৫ তারিখে সারাদিন ছুটোছুটি করে ব্যাংকের অনুমতি নিয়ে ডলার ক্রয় করে তিনি যখন টিকেট আমাদের হাতে দিলেন তখন রাত ৮ টা। স্থির হয় যে, কায়রোতে সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে টিকেটের টাকা পেয়ে সুজাউদ্দৌলার টাকা পরিশোধ করবো। পরের দিন খুব সকালে সুজাউদ্দৌলা নিজে এসে আমাদের করাচী বিমান বন্দরে পৌঁছে দেন। সুজাউদ্দৌলার সৌজন্য, কর্তব্যবোধ, মমতা এবং আন্তরিকতা আমি জীবনে কখনো ভুলব না।

করাচীর বাড়িঘরগুলো আধুনিক কালের প্রেক্ষাপটে নির্মিত। আবহাওয়া অনুসারে বাড়িঘরগুলো খোলামেলা। বারান্দা আছে, উন্মুক্ত জানালা আছে, কোথাও কোথাও খোলা সিঁড়ি আছে। নতুন বাড়ীগুলোর কোনোটাই আবদ্ধ নয়। বাইরের রাস্তা অথবা বাড়ির আঙ্গিনার সঙ্গে

www.pathagar.com

বাড়ির অভ্যন্তর ভাগের একটি সংযোগ আছে। করাচী কোনো ঐতিহাসিক শহর নয়। সুতরাং প্রাচীন কোনো ভবন এই শহরকে অলংকৃত করেনি। আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এখানকার বাড়িঘরগুলো তৈরী হয়েছে। স্থাপত্য শিল্পের দিক থেকে মোহনীয় শিল্প নিদর্শন এ শহরে না থাকলেও ব্যবহার উপযোগী অট্টালিকা অনেক নির্মিত হয়েছে। কায়রোতে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে আমরা প্রবেশ করলাম। প্রাচীন অট্টালিকা, মসজিদ, প্রাসাদ, দুর্গের ভগ্নাংশ–এর সব কিছু কায়রো শহরকে প্রাচীন সম্পদের অধিকারী করেছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো ভবনগুলোকে অস্বীকার না করে বরঞ্চ সেগুলোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন ব্যবহার উপযোগী ভবন নির্মিত হয়েছে। সাধারণ বাসগৃহ প্রাচীন গ্রীক বা রোমক শিল্পের (অংশত) অনুকরণে স্তম্ভশোভিত হয়ে পরিদৃশ্যমান হয়েছে।

১৯৫৬ সালে আমি প্রথম কায়রো এসেছিলাম এবং শেষবার কায়রো গিয়েছিলাম ১৯৬০ সালে। কিন্তু এবার দেখলাম সে পুরনো কায়রো আর নেই। কায়রো শহর চতুর্দিকে অনেক ছড়িয়েছে। বিমানবন্দরের কাছাকাছি পর্যন্ত একদিকে অন্যদিকে গীজার কাছাকাছি পর্যন্ত শহরের বিস্তৃতি ঘটেছে। কিন্তু ইতিহাসের প্রেক্ষাপট কোথাও মুছে যায়নি। গীজার কাছাকাছি বাড়িগুলো অনেকটা পিরামিডের আদলে নির্মিত। আবার অন্যদিকে বিমান বন্দরের পথে রাস্তার বিভিন্ন দিকে রামেসিসের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। কোথাও কোথাও প্রাচীন দেবতা আমন–রার মূর্তি একটি পুরোনো ইতিহাসের কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। প্রাচীন কালে মিশরে একটি শিল্পগত আনন্দের প্রকাশ ছিল। মিশরীয়রা যা কিছু স্পর্শ করেছিল তাকেই সুন্দর করে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছিল। তারা গ্রীকদের মতো সুচারু সমতায় কোনো কিছু করেনি । তারা বিপুল এবং বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনায় সবকিছুকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছে। সেই প্রাচীনকালে তাদের মূর্তিগুলো দেখে একটি রাজকীয় বিশালতা এবং মহিমান্বিত রূপ মানুষের মনে জেগে ওঠে। শিল্প সমালোচকরা একে বলেছেন, রিগাল মনুমেন্টালিটি। বর্তমান মিশরীয় সরকারও মিশরের এই প্রাচীন চরিত্রকে ধরে রাখবার চেষ্টা করছেন।

প্রাচীনকালের মিশরের রাজারা ছিলেন দেবতার পর্যায়ভুক্ত। শুধু রাজারাই নন, রাজপরিবারের সকলেই। তারা যখন রাজাদের মূর্তি নির্মাণ করেছে তখন তার মধ্যে একটি অলৌকিকতা দান করবার এবং অবিনশ্বরতা দান করবার চেষ্টা করেছে। প্রতিটি মূর্তি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত, যাকে ইংরেজীতে বলা হয়ে থাকে কনফিডেন্ট। তাদের দৃষ্টি দর্শকদের দৃষ্টির ঊর্ধ্বে অনেক দূরের দিকে প্রসারিত এবং তাদের শরীর সুস্থ এবং বলিষ্ঠ। মূর্তিগুলো দেখে মনে হয় যে, এদের মধ্যে মনুষ্য জীবনের ভয়, আশা ও নির্যাতনের কোনো উপলব্ধি নেই, বরং একটি অনন্ত জীবনের আশ্বাসের স্বাক্ষর আছে। প্রথমবার যখন মিশরে এসেছিলাম তখন এবং তারপরে দ্বিতীয়বার আমি মিশরের প্রাচীন যাদুঘরটি ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম। এই যাদুঘরে প্রাচীনকালের ঐশ্বর্যের পর্যাপ্ত নিদর্শন রয়েছে। আমি পূর্বে যাদুঘরে মমি দেখতে পেয়েছিলাম। বর্তমানে মমি কাউকে দেখানো হয় না। আনোয়ার সাদত মমিকে লোক দৃষ্টির আড়ালে রেখে দেবার আদেশ

www.pathagar.com

দিয়েছিলো। তার বক্তব্য ছিল, এই সমস্ত মমি যাদের তারা এককালে মহাপ্রতাপশালী সম্রাট ছিলেন। তাদেরকে অবারিতভাবে জনসমক্ষে উপস্থিত করা উচিত নয়। গীজার তিনটি পিরামিড এবং একটি স্ফীংস যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর মানুষকে হতচেতন এবং বিহ্বল করে রেখেছে। এক একটি নিঃসঙ্গ পর্বতের মতো এই বিপুল আয়তনের পিরামিডগুলো কি করে নির্মিত হয়েছিল এবং কারা নির্মাণ করেছিল এ কথা সুস্পষ্ট নয়। সে যুগের মানুষ জীবনের চিরকালীনতায় বিশ্বাস করতো বলেই মৃত্যুকে তারা নতুন একটি জীবনের দ্বার উন্মোচন হিসাবে বিবেচনা করেছিল। তাই তারা সমাধি মন্দিররূপে বিপুল আয়তনে পিরামিডগুলো নির্মাণ করেছিল, যেখানে এককালের অধীশ্বর মৃত্যুর পরও যেন জীবনের ঐশ্বর্য ভোগ করতে পারে, এমন ব্যবস্থা তারা করেছিলেন। জীবিতকালে এরা যে জীবনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তদের আত্মা সে জীবনের সৌভাগ্য এবং সম্পদকে আশ্রয় করে যেন চিরকালীন স্বস্তিতে বাস করতে পারে, সমাধি মন্দিরের মধ্যে সেই ব্যবস্থা রাখবার চেষ্টা করা হয়েছিল।

মিশর যেমন একটি প্রাচীন সভ্যতার রহস্য নিকেতন, তেমনি ইসলামী সভ্যতারও একটি আশ্চর্য সমৃদ্ধমান ক্ষেত্র। আরব ভূমি থেকে ইমাম হোসাইনের নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের পর ইমাম পরিবারের সকলে মিশরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এখনো কায়রোতে ইমাম হোসাইনের মস্তকের সমাধি, তাঁর পত্নী বিবি জয়নাবের সমাধি, তাঁর দৌহিত্রী সৈয়দা নফিসার সমাধিসৌধ আছে। প্রতিটি সমাধিসৌধের সঙ্গে একটি করে সুরম্য মসজিদ আছে। এর সব কটি সমজিদে আমি নামাজ আদায় করেছি এবং মাজার জিয়ারত করেছি। এ সমস্ত মসজিদ এবং সামাধিসৌধ তুর্কী স্থাপত্যের নিদর্শন বহন করে। তুর্কী স্থাপত্যের অনন্যসাধারণ নিদর্শন হচ্ছে কায়রোর মোহাম্মদ আলী মসজিদ। বিপুল আয়তনের এবং দুর্নিরীক্ষ উচ্চতায় এই মসজিদটি ইস্তাম্বুলের মসজিদগুলোর কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল।

এখানে একটি ঘটনা বলি। আমি একদিন ট্যাক্সি করে হোটেলে ফিরছিলাম। গাড়ীতে বসে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে কায়রোর মসজিদগুলোর কথা জিজ্ঞেস করছিলাম। সে মোহাম্মদ আলী মসজিদের নামই উল্লেখ করল না। আমি যখন তাকে এই মসজিদের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম তখন সে বলল, "ওটা তো তুর্কী মসজিদ, ওটা আমাদের নয়।" স্থানীয় রাজনীতিতে আরব জাতীয়তাবাদ এমন প্রবলভাবে প্রবেশ করেছে যে, মিশরে তুর্কী আধিপত্যের কাহিনীগুলো অনেকে স্মরণ করতে চায় না। কায়রোতে সিংহাসনচ্যুত রাজা ফারুকের একটি যাদুঘর আছে। ফারুকের একটি শখ ছিল প্রজাপতি সংরক্ষণ করা। নানা ধরনের প্রজাপতি শো-কেসের মধ্যে সাজিয়ে রাখা। বিভিন্ন রঙের এবং রেখাঙ্কিত বিবিধ প্রকার এই প্রজাপতি মানুষের দৃষ্টিকে আনন্দ দেয়। তাছাড়া নানা ধরনের হরিণ তিনি শিকার করেছেন, সেই সমস্ত হরিণের পা এবং মাথা সাজানো আছে। হাতির কান দিয়ে একটি টেবিলের উপরিতল নির্মাণ করা হয়েছে। রাজার ব্যবহৃত কিছু মণিমুক্তাও এই যাদুঘরে রক্ষিত আছে। নানাবিধ ব্যসন এবং দ্যূতক্রীড়ায় সময় কাটলেও শিল্প সৌন্দর্যের প্রতি ফারুকের কিছুটা অনুরাগ ছিল মনে হয়।

www.pathagar.com

কনফারেন্সের শেষে আমরা সুয়েজ খালের পোর্ট সৈয়দের কাছে ইসমাইলিয়া শহরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। গাড়ীতে করে কায়রো থেকে ইসমাইলিয়া যেতে দু'ঘন্টা লাগে। রাস্তার দু'পাশে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠছে দেখলাম, বিশেষ করে ইসমাইলিয়া শহর একেবারেই নতুন। বাড়িঘর নতুন ধরনের। কায়রোর সঙ্গে একেবারেই মেলে না। আধুনিক বাসোপযোগী গৃহ স্থানীয় আবহাওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে গড়ে উঠেছে।

কায়রো হচ্ছে আরবী সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। কোরান শরীফের পঠনের নানাবিধ রীতি মিশরীয়রাই প্রবর্তন করেছে। বর্তমান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ক্বারী বাসেতের কণ্ঠে কোরান শরীফের আবৃত্তি শুনেছি। অনবদ্য তাঁর কণ্ঠস্বরের কোনো তুলনা নেই। আরব দেশসমূহের মধ্যে মিশরই একমাত্র দেশ যেখানে কোরান শরীফের ভাষা সম্মানিত মর্যাদায় প্রতিদিনের ব্যবহার্য জীবনের মধ্যে উচ্চারিত হয়। ধ্রুপদী আরবী ভাষার চর্চা প্রধানত মিশরেই আছে। টেলিভিশনে আরবী ভাষণগুলো শুনতে অপূর্ব লাগে। সাধারণ মানুষের কণ্ঠে একটি ভাষার যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে মিশরে সেই পরিবর্তন আরবী ভাষাকে স্পর্শ করেনি। স্থানীয় লোকদের কাছে শুনলাম যে, এর একমাত্র কারণ আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব। ভাষার ক্ষেত্রে আল আজহারের একটি মৌন শাসন রয়েছে যা সকলেই মান্য করে। এই শাসনের আওতায় থেকে আরবী ভাষার ধ্রুপদী রূপকে সেখানকার অধিবাসীরা সম্মানের সঙ্গে প্রচলিত রেখেছে।

মিশরে আরবরা এসেছিলেন ইসলাম প্রচারের প্রথম শতাব্দীতেই। কায়রোতে যে ট্যাক্সিচালক মোহাম্মদ আলী মসজিদ সম্পর্কে উৎসাহ প্রকাশ করেনি সেই আমাকে আমর-ইবনুল-আস-এর মসজিদের কথা বলেছিল। হযরত ওমরের খেলাফতের সময়ে আমর ইবনুল-আস-এর নেতৃত্বে আরব সেনারা মিশরে প্রবেশ করে ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে। কয়েক বছরের মধ্যে মিশর আরবদের অধিকারে আসে এবং তখন থেকেই ক্রমশ মিশরীয়রা আরব জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়। আরবরা মিশরে বসতি স্থাপন করলে জাতিগত মিশ্রণ ঘটতে থাকে স্থানীয়দের সঙ্গে এবং বর্তমান মিশরীয়রা পুরোপুরিই আরব। শুধু তাই নয়, কোরান শরীফের ভাষাগত এবং উচ্চারণগত শুদ্ধি সংরক্ষণ একমাত্র মিশরেই সম্ভবপর হয়েছে। আজ থেকে শতাধিক বছর পূর্বে আরবী বা ইসলামী জ্ঞানের যথাযথ সিদ্ধির জন্য বাংলাদেশের মানুষ মিশরে গিয়েছে। আমার দাদা উচ্চশিক্ষার জন্য মিশরে গিয়েছিলেন। ধর্মবিষয়ক জটিল কোনও সিদ্ধান্তের জন্য আমরা আল-আজহারের কাছে যেতাম। আল-আজহারের প্রতিপত্তি যুগে যুগে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, শুধু আমাদেরই সঙ্গে আল আজহারের সংযোগ নষ্ট হয়েছে।

মিশরে সেই যে মুসলিম শাসন শুরু হয়েছিল অদ্যাবধি সেই দেশে ইসলাম এবং মুসলমানদের প্রতিপত্তি অব্যাহত রয়েছে। উমাইয়া খেলাফতের পর আব্বাসীয় খেলাফত এল। অবশেষে দশম শতকে ফাতেমীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হল। ফাতেমীয়রা ছিল শিয়া। এরাই মিশরকে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসত্তায় পরিণত করে। এ সময় আল-আজহার মসজিদ নির্মিত হয় এবং মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। আল আজহার ক্রমশ প্রসারিত হয়েছে

www.pathagar.com

সমৃদ্ধশালী হয়েছে। বর্তমান আল আজহার পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন শিক্ষায়তন এবং আল-আজহারের মসজিদটি একটি দর্শনীয় স্থাপত্য শিল্প।

আল আজহারের কাছেই কায়রোর বিখ্যাত বাজার খান-খলিলী। এ ধরনের বাজার আমি ইস্তাম্বুলে দেখেছি, তেহরানে দেখেছি, পেশোয়ারে দেখেছি, লাহোরে এবং দিল্লীতে দেখেছি। সকল প্রকার দ্রব্যের বিপণীসজ্জা নিয়ে অজস্র মানুষের কলগুঞ্জনের মধ্যে এ বাজারটি মধ্যযুগের জীবন যাপনকে উদ্ভাসিত করে। একের পর এক সরু গলিগুলো বিভিন্ন বিপণী প্রসাধনের সামনে দিয়ে একেবেঁকে রহস্যময় আবর্ত নির্মাণ করেছে। এ ধরনের বাজার কখনো পুরনো হয় না। একই রকম স্বভাবে যুগ যুগ ধরে মানুষের ইচ্ছাকে এবং আগ্রহকে ধারণ করে রাখে। আমি শুধু এই বাজারের বৈশিষ্ট্য দেখবার জন্য কিছুটা সময় এর মধ্যে কাটিয়েছিলাম। প্রথমবার যখন কায়রোতে এসছিলাম তখন পিরামিড যুগের কিছু পুরনো নিদর্শন, বিশেষ করে আংটির পাথর এসব বাজারে পাওয়া যেত। এখনো দু'একটি দোকানে পাওয়া যায়, দাম খুব বেশী। পিরামিডের মধ্যে অনেক কিছু পাওয়া গিয়েছিল এবং একেকটি বস্তুর একাধিক সংখ্যা পাওয়া গিয়েছিল। তাই ঐগুলো যাদুঘরেও রেখেও কিছু কিছু জিনিস বাইরে বিক্রির জন্য পাওয়া যেত।

কায়রোতে ইমাম হোসাইনের মস্তকের সমাধি আছে, বলেছি। ঐতিহাসিক হিত্তি সাহেব এটা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে, দামেস্কে ইমাম হোসাইনের মস্তক হোসাইন পরিবারের হাতে প্রত্যর্পণ করা হয়েছিল। তারা সেই মস্তক কারবালার তাঁর দেহের সঙ্গে সমাধিস্থ করে। কারবালায় সমাধিস্থ করা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার মনে হয়। মিশরীয় পন্ডিতদের জিজ্ঞেস করেছি। তাঁরা বলেছেন যে, তাঁরা এ নিয়ে তর্ক করেন না। যেহেতু জনসাধারণের বিশ্বাসে ইমাম হোসাইনের নামে কবরটি বিখ্যাত হয়ে আছে, সুতরাং তাঁরাও এটাকে মেনে নিয়েছেন। ইরানীরা এখানকার কবরকে মান্য করে না, কিন্তু ভারতীয় শিয়া সম্প্রদায়ের কোনো কোনো শাখা এখানে জিয়ারত করতে আসে।

কায়রোর ইসলামী যাদুঘরে ইসলামী যুগের ইসলামী শিল্পকলার প্রভূত উপরকরণ রয়েছে। যাদুঘরটি কিন্তু জাতীয় যাদুঘর নয়। খৃষ্টপূর্ব আমলে পিরামিডের যুগের প্রাচীন যাদুঘরটি জাতীয় যাদুঘররূপে স্বীকৃত। ইসলামী যাদুঘরে নিদর্শনসমূহের সংখ্যা অনেক, যার ফলে বিভিন্ন কক্ষগুলোতে যথাযোগ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে বস্তুগুলোকে সাজানো হয়নি।

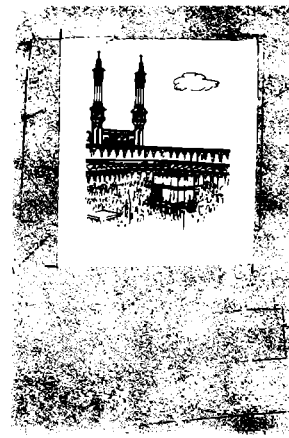

www.pathagar.com

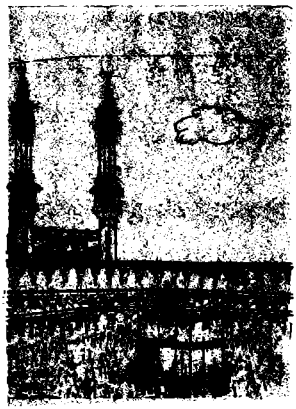

১৫ মার্চ খুব সকালে আমরা ওমরাহ করবার উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে যাত্রা করলাম। কায়রোর হোটেলেই ইহরাম বাঁধলাম। দু'টুকরো কাপড়–একটি পরিধানের জন্য, একটি গায়ে জড়ানোর জন্য। শুভ্র এ দু'টি বস্ত্রখন্ড পরিধান করে একজন মানুষ সংসার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গী হয়। সংসারের চিন্তা সে আর করতে পারে না, পার্থিব কোনো ইচ্ছা তাকে আকুল করতে পারে না, সেলাই ছাড়া শুভ্র একটি বস্ত্রখন্ড পরিধান করে এবং একখন্ড গায়ে দিয়ে একজন মানুষ কাফনের পোশাক পরে আল্লার সান্নিধ্যে উপনীত হয়। নানাবিধ নিয়ম আছে, সে নিয়ম সকলেই পালন করবার চেষ্টা করে। যেমন বিমানে আরোহণের পূর্বে অথবা কোনো যানবাহনে ওঠবার পূর্বে এ কথা প্রত্যেকের উচ্চারণ করতে হয় অথবা উচ্চারণ করা কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়, *মহান আল্লাহ এমন এক মহান সত্তা যিনি আমাদের জন্য এই বাহনকে বশীভূত করে দিয়েছেন, যার সাহায্য ছাড়া এই বাহনকে বশীভূত করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। আমরা সকলেই সেই মহান আল্লাহর কাছে ফিরে যাবো।*

আমরা মিশরীয় বিমানে দু'ঘন্টার মধ্যে জেদ্দায় পৌছে গেলাম। জেদ্দায় পৌছেও একটি দোয়া করতে হয়– *হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট এই শহরের এবং এর অভ্যন্তরস্থ সকল কিছুর জন্য মঙ্গল কামনা করছি এবং এই শহরের অভ্যন্তরস্থ অমঙ্গল থেকে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করছি। হে আমার প্রতিপালক, যেখানে প্রবেশ করা শুভ এবং মঙ্গলজনক তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যাও এবং যে স্থান থেকে বেরিয়ে আসা শুভ ও মঙ্গলজনক সেখান থেকে তুমি আমাকে বাইরে নিয়ে আস এবং তোমার উৎস থেকে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান করো।*

এভাবেই আমরা একটি প্রাচীন সমৃদ্ধমান ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকে ইসলামের প্রাচীনতম কেন্দ্রে প্রবেশের অধিকার লাভ করলাম। ইতিহাসবিদরা বলেন যে, যথার্থ সেমীয় বা সেমেটিক জাতি আরব ভূখন্ডেই অবস্থান করত এবং সেখান থেকেই তারা চতুর্দিকে নিজেদের ছড়িয়েছে। আরবরা আরব ভূখন্ডকে জজিরাতুল আরব বলে। জজিরাতুল আরব অর্থাৎ আরব দ্বীপ। অবশ্য আরব ভূখন্ড দ্বীপ নয়–এর তিনদিকে পানি কিন্তু উত্তরাঞ্চল ভূমিসংলগ্ন। বিপুল আয়তনের এই ভূখন্ডের অধিকাংশ এলাকাই মরুভূমি। মাঝে মাঝে মরূদ্যান আছে। এই মরূদ্যানগুলোই এক সময় এখানকার অধিবাসীদের জীবন ধারণের উৎস ছিল। তাছাড়া মধ্যযুগে বাণিজ্যের যাত্রাপথ হিসাবে আরব ভূখন্ড প্রসিদ্ধ ছিল। এশিয়ার এবং আফ্রিকার বাণিজ্য সরঞ্জামগুলো আরব ভূখন্ডের কিছু কিছু বিশিষ্ট পথ দিয়ে যাতায়াত করত। অবশ্য তেল আবিষ্কারের পর

www.pathagar.com

থেকে এখানকার এলাকাগুলো সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করেছে এবং বিপুল সৌভাগ্যের আশ্বাস এরা পেয়েছে। আধুনিক প্রকৌশল এবং বিজ্ঞানের সুযোগ নিয়ে আরবরা তাদের দেশকে সমৃদ্ধমান করেছে। এদেশে প্রবেশ করবার ইচ্ছা সকল মুসলমানেরই থাকে, আমারও ছিল। এখানে প্রবেশের অধিকার পেয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করলাম।

কোরান শরীফে আদ এবং সামুদ জাতির কথা আছে যারা আরব ভূখন্ডের আদিম জাতিসত্তা হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। আদ জাতি হাজরামাউত অঞ্চলে অবস্থান করত। তারা ছিল দীর্ঘদেহী, সচল, বলিষ্ঠ এবং গর্বিত। তারা মূর্তিপূজা করত। তাদের মধ্যে হুদ নামক একজন পয়গম্বর এসেছিলেন। তিনি তাদের সৎপথে আনবার চেষ্টা করছেন এবং এক আল্লাহর ইবাদত করতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তারা হুদকে ব্যঙ্গ করে বলল, *তুমিতো তোমার আল্লার কোনও নির্দেশ আননি। মনে হয় আমাদের কোনও দেবতা তোমার মস্তিক বিকৃতি ঘটিয়েছেন।* তখন তাদের দেশে প্রচন্ড খরা নামলো, বৃষ্টি বন্ধ হল, শস্য পুড়ে গেল। তাদের শীর্ষস্থানীয় লোকেরা বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে মক্কায় লোক পাঠাল। প্রার্থনা শেষে তিন রঙের মেঘ আকাশে দেখা দিল–সাদা, লাল এবং কালো। ঐশীবাণী এলো, *এ তিনটি মেঘ থেকে একটি মেঘ বেছে নাও।* প্রচুর বৃষ্টি আছে ভেবে তারা কালো রঙ বেছে নিল। মেঘখন্ড আদ জাতিদের ভূখন্ডের উপর থামল এবং প্রচন্ড ঝড় ও ধ্বংস বর্ষণ করল। এভাবে অবিশ্বাসের কারণে আদ জাতি ধ্বংস হয়েগেল।

সামুদ জাতি বাস করত উত্তর আরবে। হিকটক এবং সিরিয়ার মধ্যবর্তী ভূখন্ডে। সামুদরাও তাদের পয়গম্বরের নির্দেশ মানেনি এবং অবিশ্বাসের কারণে তারাও ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত এ সমস্ত অবিশ্বাসী জাতিদের জন্যও মক্কা ছিল পবিত্র নগরী।

লোককাহিনীতে এবং ইতিহাসে মদিনাও একটি শুদ্ধ এবং পবিত্র নগরী। দক্ষিণ আরবের লোকগাঁথায় আসাদ কামিলের গল্প আছে–যিনি পুত্রহত্যার প্রতিশোধের মানসে মদিনা নগরী ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। পারস্য অভিযানে জয়যুক্ত হয়ে তিনি যখন প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন শুনলেন যে, তার পুত্র নিহত হয়েছে যাকে তিনি মদিনায় রেখে গিয়েছিলেন। এ খবর শুনে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি মদিনা শহরকে নিশ্চিহ্ন করবেন। এ খবর যখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল তখন বনি কোরায়জা গোত্রের দুজন ইহুদী ধর্মযাজক আসাদ কামিলের কাছে এলেন এবং বললেন, "হে রাজন, এমন কাজ নিশ্চয়ই আপনি করবেন না যাতে আপনার উপর অভিসম্পাত আসতে পারে।" আসাদ কামিল জিজ্ঞেস করলেন, "তার অর্থ?" উত্তরে তারা বললেন, "এ নগরী একজন প্রেরিত পুরুষের আবাসস্থল হবে। তিনি তাঁর জন্মভূমি ত্যাগ করে এখানে আশ্রয় নেবেন। সেই মর্যাদাবান মুহূর্তের জন্য এ নগরী অপেক্ষা করছে।" আসাদ কামিল তাঁদের বাক্য মানলেন। এভাবে পবিত্র মদিনা নগরী রক্ষা পেল।

www.pathagar.com

এ দুটি নগরীকে নিয়ে আরো অনেক উপাখ্যান আছে এবং সব উপখ্যানে নগরী দু'টির প্রতি পরমতম শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। স্থানীয় লোকদের মুখে শুনেছি যে, বিশ্ব সৃষ্টির সূত্রপাতেই বিধাতা এ দুটি নগরীকে মর্যাদাবান কাম্য নগরী হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। এগুলো ইতিহাসের কথা নয়, এগুলো বিশ্বাসের কথা। আল্লাতায়ালা যখন হযরত আদমকে সৃষ্টি করলেন এবং ফেরেশতাগণকে তাঁকে সেজদা করতে বললেন তখন আজাজীল সেজদা করতে অস্বীকার করল। তার ফলে সে অভিশপ্ত শয়তান হয়ে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হল। লোকেরা বিশ্বাস করে যে, সে মুহূর্তে ফেরেশতাগণ শংকায়, শ্রদ্ধায় এবং বিনয়ে আল্লার আসন আরশের চতুর্দিকে পরিক্রমণ করতে লাগলেন। আল্লার কাছে এই পরিক্রমণটি ভালো লাগলো। হযরত আদম যখন মক্কায় এলেন তখন আরশের ছায়া অনুসরণ করে তিনি কাবা ঘর প্রথম নির্মাণ করেন এবং তার চতুর্দিকে পরিক্রমণ বা তাওয়াফের প্রথা প্রবর্তন করেন। সুতরাং লোকবিশ্বাস মতে মানব সৃষ্টির সূত্রপাতেই মক্কা নগরীতে কাবা গৃহ নির্মিত হয়েছিল এবং তার চতুর্দিকে তাওয়াফ সেই সময় থেকেই প্রচলিত হয়েছিল।

এ রকম বিশ্বাসের কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত হয়ে অনেক লোকগাঁথা সৃষ্টি করেছে। নিকলসন সাহেব 'এ লিটারেরী হিস্টরী অব দি আরবস' নামক গ্রন্থে এ ধরনের অনেক লোককাহিনীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং সেগুলোর উপর নির্ভর করে আরবদের ইতিহাস আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। এ সমস্ত কাহিনীর মাধ্যমে একটি সত্য স্পষ্ট হয়েছে যে, মক্কা এবং মদিনা নগরী দুটি আরব ভূখন্ডের প্রাচীনতম সম্মানিত স্থান। তীর্থভূমি হিসাবে মক্কা আদিমকালেও যেমন শ্রদ্ধেয় ছিল চিরকালই তেমনি শ্রদ্ধেয় আছে।

কায়রো থেকে ইজিপ্ট এয়ারে জেদ্দায় পৌছাতে বেশিক্ষণ লাগে না। বিমানের ঘোষণা অনুসারে ১ঘন্টা ৪০ মিনিট লেগেছিল। জেদ্দা বিমান বন্দরটি বর্তমানের পৃথিবীর বৃহত্তম বিমান বন্দর এবং আধুনিকতমও বটে। বর্তমানে তিনটি টারমিনাল নির্মিত হয়েছে–নর্থ টারমিনাল, সাউথ টারমিনাল এবং হজ্জ টারমিনাল। প্রতিটি টারমিনালই তাঁবুর আদলে গড়া। বহু দূর থেকে অথবা আকাশ থেকে হজ্জ টারমিনালকে আরাফাতের ময়দানের শুভ্র তাঁবুর বিন্যাস বলে মনে হয়। ছোট ছোট তাঁবুর আদলে পিলারের উপরে অবস্থিত কংক্রীটের ছাদগুলো যেমন আধুনিক প্রকৌশল–প্রজ্ঞার পরিচায়ক তেমনি আরবের ইতিহাস ও সমাজের সঙ্গে ভাবগতভাবে সমন্বিত। অন্য দুটি টারমিনাল বিপুল আয়তনের তাঁবুর মতো। টারমিনালের অভ্যন্তরস্থ ব্যবস্থাপনাও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত। হোবার ক্রাফটের মতো বাস নিচ থেকে দোতলায় উঠে আসে এবং প্যাসেঞ্জার নিয়ে আবার নিম্নগতি হয়ে মাটিতে নামে এবং বিমানের দিকে এগিয়ে চলে। বিমানের দরোজার কাছে এসে আবার বাসটি উঁচু হয় এবং বিমানের দরোজার সঙ্গে সংলগ্ন হয়। যাত্রীদের সুযোগ–সুবিধার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা টারমিনালগুলোর আছে। তবে এখানকার সিকিউরিটি এবং কাস্টমস অত্যন্ত কঠোর এবং নিয়মতান্ত্রিক। এর ফলে প্যাসেঞ্জারদের বেরিয়ে আসতে সময় লাগে। আমরা জেদ্দা বিমান বন্দরে নেমেছিলাম ১০টায়। কিন্তু সিকিউরিটি এবং

www.pathagar.com

কাস্টমস অতিক্রম করতে দেড় ঘন্টারও বেশী সময় লেগেছিল। বিমান বন্দরে মিঃ খান বলে এক ভদ্রলোক আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মিঃ খান একজন প্রকৌশলী এবং আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডক্টর আলী আশরাফের একজন বন্ধু। আশরাফের নির্দেশেই খান সৌদি আরবে আমাদের দেখাশোনা করছিলেন। মক্কা নগরীতে হারাম শরীফের কাছেই কেন্দ্রীয় পোস্ট অফিসের বিপরীতে পুরনো ধরনের বাড়ির চারতলার একটি ফ্ল্যাট আশরাফ ভাড়া করে রেখেছে। সে নিজে যখন মক্কায় আসে তখন এখানেই থাকে। আমাদের জন্য এখানে থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

বর্তমান বিমান বন্দর থেকে মক্কা নগরী ৮০ মাইলের দূরত্বে অবস্থিত। কিন্তু মসৃণ ও প্রশস্ত রাজপথ নিয়ে এর দূরত্ব অতিক্রম করতে ১ঘন্টার মতো সময় লাগে। লিমোজিনে করে যেতে গাড়ির দ্রুত গতি অনুভব করাই যায় না, প্রশস্ত বলে পথে কোনো বাঁধাও উপস্থিত হয় না। পথের দুদিকে সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি। কিন্তু কোথাও কোথাও সরকারী চেষ্টায় জনপদ গড়ে উঠেছে এবং বিপুল এলাকা জুড়ে ইমারত তৈরী হয়েছে। তাছাড়া বিপুল অর্থ ব্যয়ে বৃক্ষ রোপণেরও প্রয়াস চলছে। মনে হয় ক্রমান্বয়ে জেদ্দা থেকে মক্কা পর্যন্ত পথের দু'ধারে সবুজ গাছের সমারোহ দেখা যাবে। পথের দুদিকের দৃশ্যের নানাবিধ পরিবর্তন গড়ে উঠেছে। এই পরিবর্তনগুলো আধুনিক বিজ্ঞানকে ব্যবহার করার ফলেই ঘটেছে। বিপুল অর্থের ব্যবহারের সাহায্যে রুক্ষ উষ্ণ মরুভূমিকেও এ দেশের সরকার সজীব জনপদে রূপান্তরিত করার প্রয়াস পাচ্ছে।

পথে যানবহন বেশি ছিল না। অনেকটা নিষ্কন্টক যাত্রায় আমরা মক্কা শরীফে এসে পৌছলাম। মক্কা শরীফে প্রবেশের মুখে প্রার্থনা করলাম, *হে আমার প্রভু, আমি তোমার সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়েছি, তুমি মহান বিশ্বপালক, তুমি আমাকে আশ্রয় দাও এবং এই নগরীর পবিত্রতায় আমাকে আচ্ছন্ন করো।* জেদ্দা থেকে মক্কা পর্যন্ত যানবাহন জটিল এবং বিপুল না হলেও মক্কা শহরের অভ্যন্তরে যানবাহনের জটিলতা ছিল প্রচন্ড। যদিও অনেক হাইওয়ে তৈরী হয়েছে এবং অনেকগুলো হাইওয়েকে ফ্লাই ওভারের সাথে যুক্ত করা হয়েছে তবু একই রাস্তায় গাড়ির চাপে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া বেশ দুরূহ বলে মনে হচ্ছিল। তবে এখানকার গাড়ির চালকরা অত্যন্ত দক্ষ এবং হিসেবী। এখানে এক্সিডেন্ট খুব কম হয়। কেননা এক্সিডেন্ট হলেই গাড়ি চালকের ভীষণ শাস্তি পেতে হয়। কোনো গাড়ির চাপে কোনো পথযাত্রী নিহত হলে গাড়ি চালককে কয়েক লক্ষ টাকা খেসারত দিতে হয়। এক্ষেত্রে কোনো রকম মাফ নেই। এ দেশে আইনের শাসন প্রচন্ড এবং আইন এড়ানোর ক্ষমতা কারোরই নেই। আইনে যা আছে অক্ষরে অক্ষরে তা পালিত হয় এবং সে ক্ষেত্রে কোনো রকম ক্ষমা নেই। হঠাৎ মনে হতে পারে এটা খুব নিষ্ঠুর ব্যবস্থা কিন্তু এ ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে মরুভূমির দুর্ধর্ষ মানুষগুলোকে শাসনে রাখা সম্ভবপর হত না। অবধারিত শাস্তি এড়াবার জন্যই মানুষ আইন মান্য করে চলে।

www.pathagar.com

রাস্তায় পথচারী পারাপারের বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই। গাড়ি চলছে তার মধ্যেই গাড়ির দিকে হাত দেখিয়ে মানুষ রাস্তা পারাপার করছে। মানুষ দেখলেই চলতি গাড়িগুলো গতি কমিয়ে আনে এবং মানুষকে পথ পেরিয়ে যাবার সুযোগ করে দেয়। গাড়ির প্রচন্ড ভীড়ের মধ্যে এটা যে কি করে সম্ভবপর হচ্ছে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। যে পথচারী রাস্তা পার হচ্ছে তার একটি নিশ্চিন্ততা আছে যে, কোনো গাড়ির ড্রাইভার বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালিয়ে তাকে চাপা দেবে না। রাস্তার উপর মানুষেরই অধিকার বেশি, গাড়ির নয়। ব্রাজিলে রিয়ো ডি জেনিরো শহরে একটি ভিন্ন ব্যবস্থা দেখেছিলাম। গাড়ির ধাক্কা খেলে অথবা গাড়ির তলায় চাপা পড়লেই পথচারীকে সেখানে দোষী সাব্যস্ত করা হয় যার ফলে সে দেশের পথচারীরা খুব সাবধান হয়ে পথ চলে। তবে দুর্ঘটনাও সেখানে অনবরত হয় তার কারণ গাড়ির গতিবেগ সেখানে নিয়ন্ত্রিত নয়। আরব দেশের ব্যবস্থাটাই আমার ভালো লাগলো বেশি। সেখানে চালকের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে এবং শাস্তি এড়াবার কোনো সুযোগ একেবারেই নেই বলে যানবাহনের গতি স্বভাবতই নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং চালকরা অত্যন্ত বিবেচনার সঙ্গে গাড়ি চালায়। তাছাড়া গাড়ি নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে, চালককে সব সময় গাড়ির সক্ষমতা সার্টিফিকেট সঙ্গে রাখতে হয়। সক্ষমতা সার্টিফিকেট অর্থাৎ রুট ওয়ার্দিনেস। সেখানকার বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, কারো মুখেই যানবাহন চলাচল ব্যাপারে কোনো বিরূপ মন্তব্য শুনিনি।

সৌদি আরবে বিচার ব্যবস্থাটা তাৎক্ষণিক অর্থাৎ বিচার ব্যবস্থায় বিলম্বীকরণের কোনো সুযোগ নেই। কোথাও কোনো দুর্ঘটনা, সংঘর্ষ অথবা অন্যায় সংঘটিত হলে সঙ্গে সঙ্গেই বিচারের আয়োজন হয় এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই বিচারকের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়। আমার চোখের সামনে বিচার ব্যবস্থার কোনো ঘটনা আমি দেখিনি। কিন্তু সৌদি আরবে অবস্থানকালে বাংগালী এবং অন্যান্য বিদেশী যাদের সঙ্গেই আমার সাক্ষাৎ হয়েছে তাদের মুখেই এখানকার বিচারের দ্রুত সমাধানের কথা আমি শুনেছি। সাক্ষ্য ব্যবস্থাটা আরবদের একটি ট্রাডিশন বা ঐতিহ্য। হাদিসের শুদ্ধতা যাচাই করা হয়েছে বিভিন্ন সাক্ষ্যপরম্পরার সাহায্যে। সুতরাং সাক্ষ্যকে এদেশে চিরকাল মান্য করা হয়। এর ফলে সাক্ষীর সততা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলে সেটাকেই প্রমাণ হিসাবে মান্য করা হয়। আমাদের দেশে বৃটিশ আইনের নিয়মতান্ত্রিক ধারায় বিচার ব্যবস্থাটা অত্যন্ত বিলম্বিত। সত্য নির্ধারণের জন্য নানাবিধ জটিল কলা-কৌশল তৈরী হয়েছে যার ফলে শেষ পর্যন্ত সুবিচার হয় কিনা এটা নিয়েও অনেকে সংশয় প্রকাশ করে থাকেন। তাছাড়া বিলম্বের কারণে বিচারের যথার্থ সিদ্ধি ঘটে কিনা এ নিয়েও প্রশ্ন উঠে থাকে। সৌদি আরবে তাৎক্ষণিক বিচারের ফলে অন্যায়ের পুনরাবর্তন ঘটে না বললেই হয়। নামাজের সময় দোকানপাট খোলা রেখে দোকানী মসজিদে চলে যাচ্ছে। খালি দোকানে বিপণী সজ্জা শোভা পাচ্ছে। কিন্তু দোকানের একটি বস্তুও চুরি হচ্ছে না। শাস্তি ব্যবস্থার নিষ্ঠুরতা এবং তাৎক্ষণিকতার কারণে এদেশে সততা নির্মিত হয়েছে। চুরি করলে মণিবন্ধ থেকে হাত কেটে

www.pathagar.com

ফেলে দেয়া হয়।এটা যতোই আদিম এবং নিষ্ঠুর শোনাক কিন্তু এর ফলে চুরি করবার সাহস মানুষ হারিয়ে ফেলে। বিচারের এই আদিমতার কারণেই পাপ এবং স্খলনের সুযোগ যথার্থই কম। আমি পূর্বেই বলেছি এখানকার শাসন ব্যবস্থার এখানে ক্ষমা বলে কোনো বস্তু নেই এবং ক্ষমাকে লঘুকরণেরও কোনো পদ্ধতি নেই। কতগুলো ক্ষেত্রে ক্ষমা করবার অধিকার নির্যাতিত পক্ষের উপর। ধরা যাক, আলফাতাহ বলে এক ব্যক্তি হাম্মাদকে হত্যা করেছে। এখানে হত্যার বদলে হত্যা আইনের এই নিয়মে আলফাতাহ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে। এ ক্ষেত্রে দণ্ডকে লঘু করবার একমাত্র অধিকার হাম্মাদের পুত্র কিংবা কন্যার। সেখানেও কিছু বিশিষ্ট নিয়মকানুন আছে যা সর্বদাই মান্য করা হয়। একটি দেশের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন দেশের মানুষকে সংশয়মুক্ত এবং অকল্যাণ ও গ্লানি থেকে মুক্ত করা। সৌদি আরব বিচার ব্যবস্থায় এই নীতি সর্বদা অনুসৃত হয়ে থাকে। মানুষে মানুষে মানবীয় সম্পর্কের যথার্থ বিকাশমানতার জন্য অন্যায়ের প্রতিরোধের প্রয়োজন এবং গ্লানিমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন।

সৌদি আরবে একটি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। এখানে দেশের শাসন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক নয়–কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক। এই নিয়মতান্ত্রিকতাই এ দেশকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছে। ধর্মের অনুসরণ এবং ধর্মীয় নির্দেশাবলী পালন–এগুলোও দেশের আইনের আওতায় পড়ে। যেমন নামাজের সময় নামাজ পড়তে হবে, রমজান মাসে রোজা রাখতে হবে ইত্যাদি। এগুলোর ইচ্ছাকৃত ব্যতিক্রম শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এগুলোকে কেউ ইসলামী আইন বলতে পারেন কিন্তু না বললেও কোন ক্ষতি নেই। তার কারণ সৌদি আরবে প্রাত্যহিকতা এবং সামাজিক আচরণের মধ্যে ধর্মীয় আচরণবিধি অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক মানুষের কর্মধারার মধ্যে ধর্মীয় রীতিপ্রকরণগুলো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ধর্মকে রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখলে ধর্ম নিরপেক্ষতা বা ধর্মান্ধতা এই ধরনের শব্দ একটি সমাজে তৈরী হয়। কিন্তু সৌদি আরবে এই ধরনের শব্দ কখনোই উচ্চারিত হয় না। এখানে ধর্মান্ধতার প্রশ্ন নেই, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্ন নেই। এখানে শুধু আইনগত ব্যবস্থাপনার প্রশ্ন। এদেশে বিভিন্ন ধরনের আইন নেই অর্থাৎ ধর্মীয় আইন কিংবা সামাজিক আইন অর্থাৎ আইনের ক্ষেত্রে বিচারের কোনো ব্যতিক্রম নেই।

আমি মাত্র সাতদিন সেখানে ছিলাম। সাতদিনে দেশকে প্রত্যক্ষ করা যায় না অথবা তার ইতিহাসকে আবিষ্কার করা যায় না। কিন্তু তার শাসনব্যবস্থা অথবা নিয়মের সুনিশ্চয় পদক্ষেপকে অনুভব করা যায়। এদেশে বহিরাগত অনেকে ভিসা পাসপোর্ট ছাড়া আত্মগোপন করে থাকে। এদেশে কেন, পৃথিবীর সব দেশেই এরকম ঘটে। এদের জন্য পুলিশ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় এবং পথে ঘাটে এ সমস্ত পলাতককে পেলে লোহার বেষ্টনী দেয়া খাঁচার মধ্যে ভরে প্রকাশ্য পথ দিয়ে হাজতে নিয়ে যায়। এরকম খাঁচা বড় বড় রাস্তার পাশে প্রায়ই দেখা যায়। কখন যে এই সমস্ত খাঁচা সচল হয়ে উঠবে বলা কঠিন। খাঁচাগুলো চিড়িয়াখানার জন্তু–জানোয়ার বহন করার মতো। একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক বললেন, "এই ব্যবস্থাটা যতই বন্য

www.pathagar.com

ন হোক ব্যবস্থাটা কিন্তু কঠোর এবং নিশ্চিত। এমনি গাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর
ন্তু লোহার খাঁচা থেকে পালানো যায় না।"

পৃথিবীতে মানুষ যেখানে আছে সেখানে পাপ এবং পুণ্য উভয়ই আছে। অনেক পাপ
কদৃষ্টির আড়ালে থাকে। আড়ালে ঘটে বলেই সেগুলোর বিচার হয় না এবং সেগুলো
র্কে আমরা জানি না। সৌদি আরবেও এ ধরনের পাপ যে গোপনে হয় না তা নয়।
কলোচনের আড়ালে যা ঘটে সেগুলোর দ্বারা একটি জাতিসত্তার কর্মবিধি বিশ্লেষণ করা
ত হবে না। অর্থের প্রাচুর্যের ফলে ঐশ্বর্যের অহমিকা মানুষকে উদ্ধত করে এবং আইনকে
কি দিয়ে গোপনে অপরাধ চলে। অবশ্য ধরা পড়লে যে শাস্তি হবে তাও সে জানে। এদেশে
নমা হল নেই কিন্তু ঘরে ঘরে মানুষের ভিসিআর আছে। বর্তমানে বিজ্ঞানের সর্বপ্রকার সুবিধা
য় এদেশের মানুষ প্রতাপী হয়েছে এবং সে প্রতাপ কখনো কখনো পাপ সৃষ্টি যে করবে তা
াবিক। একটি উষর মরুভূমি ক্রমান্বয়ে সজীবতার প্রাচুর্যে উচ্ছলিত হয়েছে। এই উচ্ছলতার
্যায় এ দেশের মানুষ চমৎকৃত, আনন্দিত, পরিতৃপ্ত এবং উদ্ধত ! এককালে দীন ও দরিদ্র
স্থা থেকে এ দেশের মানুষ সৌভাগ্যের চরমতম শিখরে আরোহণ করেছে। এ সৌভাগ্য
ারই দান। সুতরাং বিশ্ব বিভুর কাছে প্রতিনিয়ত মাথা নত করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন
য়ছে।

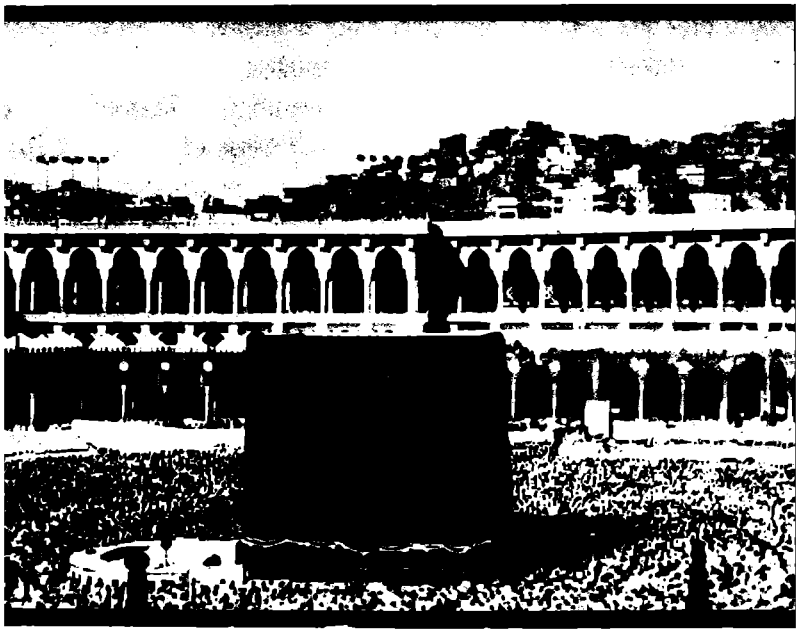

www.pathagar.com

মক্কা একটি রহস্যময় নগরী। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ যুগ যুগ ধরে এই নগরীতে প্রবেশ করবার আকাংখা করেছে এবং প্রবেশ করে স্বস্তি লাভ করেছে। আরব ভূখণ্ডে বহু নগর স্থাপত্যশিল্পে সমৃদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সেই অর্থে মক্কা নগরী কখনো সমৃদ্ধশালী ছিল না। যে স্থানে মক্কা অবস্থিত এক সময় সে অঞ্চল ছিল শুষ্ক এবং উষর। এ পথ দিয়ে যাত্রীবাহী উটের কাফেলা চলাচল করত এবং আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যের ক্যারাভাঁও মক্কা শহরের কাছ দিয়ে যেত। কিন্তু এ সমস্ত কিছু মক্কাকে সমৃদ্ধ করেনি। মক্কা সমৃদ্ধ এবং সম্মানিত হয়েছিল পৃথিবীর পবিত্রতম গৃহের জন্য, যে গৃহকে আমরা কাবা গৃহ বলে থাকি। মক্কা নগরী হচ্ছে পৃথিবীর অন্যান্য নগরীর মাতৃসমান। পৃথিবীর সকল বিশ্বাসীর কাছে এই নগরীর ঐশ্বর্য হচ্ছে অলৌকিক ঐশ্বর্য, আত্মার ঐশ্বর্য এবং এমন এক ঐশ্চর্য যা মানব আত্মাকে উদ্বুদ্ধ এবং অলংকৃত করে।

মক্কার পূর্বে এক সময় এক সংকীর্ণ উপত্যকার উপর জবল আল উবায়েস নামক পর্বত অবস্থিত ছিল। কাবা গৃহের বেষ্টনীর বাইরে জবল আল উবায়েসের অবস্থান এখনো আছে। কিন্তু তার প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পর্বতের শিরোদেশ সমান্তরাল করে প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে এবং পর্বতের পাদদেশ খনন করে পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কাবা গৃহটি প্রস্তরে নির্মিত একটি কিউবের মতো। কালো আবরণ দিয়ে এটাকে ঢেকে রাখা হয়। এর এক কোণে হিজরে আস্ওয়াদ প্রোথিত আছে। প্রতি মুহূর্তে অনন্তকাল ধরে শ্রদ্ধাবনত বিশ্বাসিগণ কাবা গৃহকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে চলেছে। আরব দেশের ঐতিহ্য এবং বিশ্বাস অনুসারে কাবা গৃহ প্রথম নির্মাণ করেছিলেন হযরত আদম। হযরত আদম ছিলেন মানব জাতির পিতা। হযরত নূহ-এর সময় প্রবল বন্যায় গৃহটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর পর হযরত ইব্রাহীম তাঁর পুত্র হযরত ইসমাইলের সাহায্যে কাবাগৃহ পুনঃনির্মাণ করেন। এরপর অনবরত সংস্কার এবং পুনঃনির্মাণের মধ্য দিয়ে কাবাঘর বর্তমান অবস্থায় এসেছে, তবে এর মূল আকৃতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। এক সময় চিন্তার অধোগতির এক পর্যায়ে আরব দেশীয়রা কাবা গৃহের মধ্যে মূর্তি স্থাপন করে। ৩৬০টি মূর্তি কাবাগৃহে স্থাপিত হয়েছিল। রসূলে খোদা এসে চিরকালের জন্য কাবা গৃহকে পৌত্তলিক শাসনমুক্ত করলেন এবং মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করলেন। কাবা গৃহের নিকটেই জমজমের পানির উৎস। কোনো এক সময় এই জমজম বালু চাপা পড়ে হারিয়ে গিয়েছিল। রসূলে খোদার পিতামহ আবদুল মুত্তালিব বহু অনুসন্ধানের পর জমজমকে আবার আবিষ্কার করেন। রসূলে খোদার জন্মের পূর্বে আবদুল মুত্তালিবই ছিলেন

www.pathagar.com

কাবা গৃহের খাদেম এবং জমজম কূপের প্রহরী। আরবীতে দুটি শব্দ আছে। একটি হচ্ছে সিকায়া অন্যটি হচ্ছে হাজাবা। প্রথমটির অর্থ হচ্ছে পানির ব্যবস্থাপক, দ্বিতীয়টির অর্থ হচ্ছে কাবার পরিচালক। এ দুটোর দায়িত্বই আবদুল মুত্তালিবের উপর ন্যস্ত ছিল।

একদিন আবদুল মুত্তালিব তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে কাবা গৃহ থেকে নির্গত হয়ে মক্কায় পথে বেরিয়েছিলেন। কাবা গৃহের বাইরের চত্বরে কুতিলা নামক বনি আসাদ গোত্রের একজন রমণী বসে ছিল। আবদুল্লাহর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই কুতিলা চমকে উঠল। সে লক্ষ্য করল আবদুল্লাহর কপালে একটি উজ্জ্বল দীপ্তি উদ্ভাসিত রয়েছে।

সে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোথায় যাচ্ছো?

আবদুল্লাহ বললেন, যেখানে আমার পিতা নিয়ে যাবেন।

কুতিলা তখন বলল, তুমি আমার কথা শোনো। আমি তোমাকে এক শ' উট দেব। তুমি আমার হও এবং আমাকে বিবাহ করো।

কুতিলার নির্লজ্জ প্রস্তাবে আবদুল্লাহ উত্তর করলেন, আমি আমার পিতার নির্দেশে তাঁর সঙ্গে চলেছি। আমি তাঁকে অমান্য করতে পারি না।

পিতা আব্দুল মুত্তালিবের সঙ্গে আবদুল্লাহ ওহাব আবদুল মান্নাফের গৃহে উপস্থিত হলেন। সেখানে ওহাবের কন্যা আমিনার সঙ্গে আবদুল্লাহর বিবাহ হয়। বিবাহের পর আবদুল্লাহ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর চাচা আবু তালিবের গৃহে গেলেন। সেখানে তিনদিন এবং তিন রাত্রি যাপন করলেন। এভাবে বিবাহ নিশি উদ্‌যাপনের পর আবদুল্লাহ যখন পথে বেরিয়েছেন পথে আবার তিনি কুতিলাকে দেখলেন, কিন্তু এবার কুতিলা আবদুল্লাহর দিকে দৃষ্টিপাত করল না। কুতিলা তার পিতা ওয়ারাকা ইবনে তোফায়েলের কাছ থেকে শুনেছিল যে, মক্কায় আল্লার প্রেরিত একজন নবী আসবেন। আবদুল্লাহর কপালে উজ্জ্বল দীপ্তি দেখে কুতিলা ধারণা করেছিল যে, আবদুল্লাহই সেই নবীর পিতা হতে যাচ্ছেন। তাই কুতিলা আবদুল্লাহকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু এখন আবদুল্লাহর কপালে সেই জ্যোতি আর দেখতে পেল না। তাই জ্যোতিহীন আবদুল্লাহর প্রতি তার আর আকর্ষণ ছিল না।

আবদুল্লাহ কুতিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, সেদিন তুমি আমার প্রতি এত আকর্ষণ দেখিয়েছিলে, আর আজ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করছো না, এটা কেমন কথা!

কুতিলা তখন বলল সেই জ্যোতির কথা যে জ্যোতি সে আবদুল্লাহর কপালে দেখেছিলো।

আবদুল্লাহ তখন তাঁর বিবাহের কথা বললেন।

কুতিলা তখন বলল, সেই রমণী ধন্যা যে তোমার জ্যোতিকে ধারণ করেছে এবং সে যথাসময়ে আল্লার প্রেরিত নবীকে জন্ম দেবে।

একদিন আমিনা একটি শব্দ শুনতে পেলেন, "তুমি তোমার গর্ভে একটি মহান শিশুকে ধারণ করছ, যে তার জনগণের প্রধান হবে। যখন সে জন্মগ্রহণ করবে তখন তার নামকরণ কর মোহাম্মদ এবং তার জন্য আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা কর।"

www.pathagar.com

কয়েক সপ্তাহ পর সন্তান জন্মের পর আমিনা তাঁর চাচার বাসায় অবস্থান করছিলেন। তিনি আবদুল মুত্তালিবকে খবর দিলেন। দাদা আবদুল মুত্তালিব শিশুকে ক্রোড়ে করে কাবা গৃহে গিয়ে আল্লার কাছে প্রার্থনা করলেন এবং পরে তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে এলেন।

তখনকার দিনে আরব দেশের সম্ভ্রান্ত পরিবারে একটি প্রথা ছিল যে, তারা নবজাত শিশুকে মরুভূমিতে কোন না কোন বেদুঈন পরিবারের মধ্যে লালন পালনের জন্য পাঠিয়ে দিত। সে সময় শিশুমৃত্যুর হার আরব দেশে খুব বেশি ছিল। সম্ভবত সেটাও একটি কারণ, সে কারণে উন্মুক্ত মরুভূমিতে বেদুঈন পরিবারের মধ্যে শিশু সন্তানকে পাঠিয়ে দেওয়া হত যেন তারা মরুভূমির উন্মুক্ততায় আলো, বাতাস এবং উষ্ণতার প্রশ্রয়ে স্বাস্থ্যবান হয়ে গড়ে উঠে। তাছাড়া বেদুঈনদের উচ্চারিত আরবী ভাষা ছিল পরিচ্ছন্ন এবং পরিশুদ্ধ। জীবনের সূত্রপাতে একটি শিশু যেন পরিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে ওঠে। কুরাইশগণের সন্তানরা এভাবে শিশুকাল থেকে প্রায় ৮ বৎসর বয়সকাল পর্যন্ত মরুভূমিতে লালিত পালিত হত। মরুভূমিতে কিছু কিছু বেদুঈন পরিবার ছিল যারা এভাবে শিশু লালন পালনের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল। মক্কার দক্ষিণ-পূর্বে এই রকম শিশু লালন পালনে অভিজ্ঞ একটি গোত্র ছিল। তার নাম বনী সাদ গোত্র। আমিনা চাচ্ছিলেন এ গোত্রের কোন রমণীর কাছে তাঁর সন্তানকে সমর্পণ করতে। এই গোত্রের এক রমণী ছিলেন হালিমা। হালিমা তাঁর স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে পালনযোগ্য শিশুর সন্ধানে মক্কায় এসেছিলেন। তাঁদের অঞ্চলে তখন খরা পড়েছিল। তাঁরা তাই একজন ধনী পরিবারের সন্তানের সন্ধানে ছিলেন। আমিনার সন্তানকে গ্রহণ করতে প্রথমে হালিমার দ্বিধা ছিল, কেননা শিশু মোহাম্মদ ছিলেন এতিম। হালিমা ভাবছিলেন, "একটি এতিম শিশুকে নিয়ে আমরা কতটাই বা লাভবান হব?" আমিনার ঐশ্বর্য ছিল না। তাঁর স্বামী মৃত্যুর আগে প্রভূত বিত্ত সংগ্রহ করতে পারেন নি। মৃত্যুর সময় তিনি যা রেখে গিয়েছিলেন তা হচ্ছে পাঁচটি উট এবং এক পাল ভেড়া ছাগল এবং একজন দাসী কন্যা। আবদুল্লাহর ছেলে একজন সম্মানিত পরিবারের সন্তান ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু দরিদ্র ছিলেন। হালিমা সমৃদ্ধমান কোন পরিবারের শিশুকে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আমিনার সন্তানকে গ্রহণ করেন।

হালিমার স্তন্যে মুখ রাখতেই প্রচুর দুধ নির্গত হতে লাগল। সেই দুগ্ধ পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে শিশু ঘুমিয়ে পড়ল। হালিমার সঙ্গে একটি উষ্ট্রী ছিল। খরার কারণে এবং খাদ্যের অভাবে উষ্ট্রীর স্তন্যে দুধ ছিল না। কিন্তু আমিনার শিশু পুত্রকে লালনের জন্য গ্রহণ করার পর পরই উষ্ট্রী দুগ্ধবতী হল। এই আলৌকিক ঘটনায় হালিমা বিস্মিত হলেন। পরবর্তীকালে হালিমা শিশু মোহাম্মদকে নিয়ে বনী সাদ গোত্রে প্রত্যাবর্তনের পথের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেনঃ *আমরা যখন বনী সাদ এলাকা ত্যাগ করে মক্কায় গিয়েছিলাম তখন প্রবল খরায় আমাদের পালিত পশুগুলো দুগ্ধহীন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু শিশু মোহাম্মদকে নিয়ে যখন আমরা ফিরলাম তখন দেখলাম পালিত পশুগুলো দুগ্ধবতী হয়েছে। আমরা দুগ্ধ দহন করে কূল পেলাম না। এত প্রচুর দুগ্ধ ছিল যে, কল্পনা করা যায় না। শিশু মোহাম্মদের আগমনের পর আমাদের অঞ্চলের খরা চলে গেল*

www.pathagar.com

এবং আমাদের সকল অসুবিধা দূর হল। বালক মোহাম্মদ অল্প দিনের মধ্যেই বড় হয়ে উঠল এবং স্বাস্থ্য সম্পদে বড় হয়ে উঠল। তার দু'বছর বয়সের সময় তাকে আমরা মক্কাতে নিয়ে গেলাম তার মাকে দেখাবার জন্য।

মক্কাতে তখন মহামারী ছিল। তাই আমিনা শিশুকে আবার আমাদের কাছে ফেরত দিলেন এবং বললেন, একে তোমরা তোমাদের কাছে মক্কার আবহাওয়া থেকে দূরে রাখ যেন শিশু স্বাস্থ্যবান হয়ে গড়ে উঠতে পারে।

এরপর আমরা আমাদের গোত্রে আবার ফিরে আসি। ফিরে আসার কিছুদিন পর বালক মোহাম্মদ আমার ছেলে অর্থাৎ তার দুধ ভাইয়ের সঙ্গে মাঠে বেড়াতে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর আমার ছেলে দৌড়ে এসে বলল, 'দুই জন সাদা পোশাক পরা পুরুষ আমার কোরেশ ভাইকে মাটিতে শুইয়ে তার বুক চিরে কি জানি করছে।'

তখন আমি এবং আমার স্বামী সেখানে দৌড়ে গেলাম। দেখলাম বালক মোহাম্মদ ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

'তোমার কি হয়েছে', জিজ্ঞেস করাতে সে বলল, 'সাদা পোশাক পরিহিত দুজন লোক আমাকে চিৎ করে শুইয়ে আমার বুক চিরে কি যেন খুঁজছিল।'

এই বক্ষ বিদারণের কাহিনী রসূলে খোদা পরবর্তীকালে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। অনেকগুলো হাদিসে এই বর্ণনা পাওয়া যায়।

বিবি হালিমার চারটি ছেলেমেয়ে ছিল। রসূলে খোদাকে শৈশবে হালিমা যখন লালন পালন করতেন তখন হালিমার কন্যা শাইমা শিশু নবীকে দোলনায় দোলা দিত, কোলে নিয়ে নাচত এবং গান গাইত।

রসূলে খোদার ধাত্রীমাতা ছিলেন বনু সা'দ গোত্রের বংশোদ্ভূত। এই গোত্র সমগ্র আরব দেশে যথার্থ আরবী উচ্চারণের জন্য এবং ভাষার লালিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই গোত্রের মানুষের ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল, সুললিত এবং মার্জিত ছিল। রসূলে খোদার শৈশবকাল এই বনু সা'দ গোত্রের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছিল। আরবী ভাষার উপর তাঁর নিজের অধিকার সম্পর্কে রসূলে খোদা পরবর্তীকালে বলেছিলেন, *আমি আরবী ভাষায় তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ এবং আমি আরবী ভাষার অপূর্ব লালিত্যের অধিকারী। এর কারণ এই যে, আমার জন্ম কোরাইশ বংশে, আমি প্রতিপালিত হয়েছি বনু সা'দ গোত্রে।*

শিশু নবীর বক্ষ বিদারণের কথা শুনে হালিমা এবং তাঁর স্বামী হারিস ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছিলো। তাঁরা ভেবেছিলেন সম্ভবত এই বালকের উপর কোন প্রেতাত্মা আশ্রয় করেছে অথবা তাঁর উপর কেন অশুভ প্রভাব পড়েছে। সুতরাং তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, শিশু মোহাম্মদকে তাঁর মাতার কাছে রেখে আসাই সমীচীন। হালিমা শিশু মোহাম্মদকে মক্কায় নিয়ে গেলেন এবং মাতা আমিনার কাছে সমর্পণ করলেন। আমিনা সন্তানকে নিজের কাছেই রাখলেন। বালক মোহাম্মদ মাতার কাছে তিন বৎসর কাল থাকলেন এবং সকলের প্রিয়ভাজন

www.pathagar.com

হলেন, বিশেষ করে তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের পুত্র হামজা এবং কন্যা শাফিয়ার সঙ্গে বালক মোহাম্মদের নিবিড় সখ্য স্থাপিত হয়। হামজা ছিল তাঁর সমবয়সী এবং শাফিয়া কিছুটা ছোট।

বালক মোহাম্মদের বয়স যখন ৬ বৎসর তখন তাঁর মাতা আমিনা তাঁকে নিয়ে ইয়াসরীবে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের কাছে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। উত্তর পথের যাত্রী একটি কাফেলার সঙ্গে আমিনা যোগ দিলেন। আমিনা একটি উটের পিঠে ছিলেন এবং বালক মোহাম্মদ দাসী কন্যা বারাকার সঙ্গে অন্য একটি উটে ছিলেন। এই যাত্রার কথা রসূলে খোদা পরবর্তীকালে আনন্দের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন যে, ইয়াসরীবে অবস্থানকালে তিনি পুকুরে সাঁতার কাটতে এবং ঘুড়ি ওড়াতে শিখেছিলেন। ইয়াসরীব থেকে ফিরতি পথে আমিনা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তিনি আবওয়া অঞ্চলে অবস্থান করেন। কাফেলা মক্কার পথে চলে যায়। এখানেই আমিনার মৃত্যু হয় এবং এখানেই তিনি সমাহিত হন। পরে অন্য একটি কাফেলার সঙ্গে বারাকা মোহাম্মদকে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কায় দাদা আবদুল মুত্তালিব বালক মোহাম্মদের পরিচর্যার ভার গ্রহণ করেন।

আবদুল মুত্তালিব সব সময় ক্বাবা গৃহের নিকটে থাকতে ভালবাসতেন। বালক মোহম্মদ তাঁর সঙ্গে ক্বাবার নিকটে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। প্রতিদিন দাদা এবং নাতী এক সঙ্গে ক্বাবা গৃহের পাশে এসে বসতেন। আবদুল মুত্তালিব যেখানেই যেতেন সেখানেই নাতীকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। যখন তিনি মক্কার প্রধানদের আলোচনা সভায় যোগ দিতেন সেখানেও বালক মোহাম্মদ তাঁর সঙ্গে থাকতেন। আলোচনার সময় বিভিন্ন বিষয়ে মন্তব্য করবার জন্য বালকের কাছেও কৌতূহলবশত প্রশ্ন রাখতেন এবং প্রশ্নের উত্তর শুনে তিনি উৎসাহিত হয়ে বলতেন, *এই বালকের ভবিষ্যত অত্যন্ত উজ্জ্বল।*

মাতার মৃত্যুর দুই বৎসর পর দাদা আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে আবদুল মুত্তালিব তাঁর পুত্র আবু তালিবের হাতে বালক মোহাম্মদকে সমর্পণ করেন এবং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তখন থেকেই বালক মোহাম্মদ চাচা আবু তালিবের গৃহে তাঁর স্নেহ ও সমর্থনে বড় হয়ে উঠতে থাকেন।

আবদুল মুত্তালিব এক সময় খুব ধনী ছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষের দিকে তাঁর বিত্ত অনেক কমে আসে। মৃত্যুর সময় তাঁর যা ছিল তা তাঁর ছেলেদের মধ্যে বন্টন করে দেন। এভাবে বন্টন হওয়ার ফলে আবু তালিবের ভাগে যা পড়ল তা অত্যন্ত নগণ্য। আবু তালিব পিতার মৃত্যুর পর দরিদ্র অবস্থায় পড়লেন। সুতরাং অর্থ উপার্জনের জন্য বালক মোহাম্মদকেও পরিশ্রম করতে দিতে তিনি বাধ্য হলেন। বালক মোহাম্মদ মেষ চারণ করা আরম্ভ করলেন। এই মেষ চারণ করতে গিয়ে তিনি প্রান্তরে, উপত্যকায় এবং পর্বতে পরিভ্রমণ করতে শিখলেন। এভাবে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর একটি গভীর যোগাযোগ স্থাপিত হল। মেষ চারণ ছাড়াও চাচা আবু তালিবের সঙ্গে তিনি বাণিজ্যে যাওয়া শুরু করলেন। যখন তাঁর বয়স ৯ (কারো কারো মতে ১২) তখন আবু

www.pathagar.com

তালিবের সঙ্গে এক বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে তিনি সিরিয়ায় এলেন। সিরিয়ার নিকটে যেখানে কাফেলা থেমেছিল সেখানে বাহিরা নামক একজন খৃষ্টান সাধু বাস করতেন। বাহিরা প্রাচীন খৃষ্টান গ্রন্থাদি পাঠে অবগত হয়েছিলেন যে, আরবদের মধ্যে একজন পয়গম্বর আসবেন। তিনি প্রায়ই দেখতেন যে, সিরিয়া যাত্রী কাফেলা সিরিয়ার পথে তাঁর আস্তানার কাছে এসে থামে। কিন্তু এবার তিনি একটি আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, এই কাফেলার মাথার উপর এক খন্ড মেঘ ছায়া দিয়ে চলেছে। তিনি আরও অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন কাফেলা যখন একটি গাছের তলায় বিশ্রামের জন্য বসেছে তখন মেঘখন্ডও গাছের উপর স্থির হয়ে রইল। সাধু বাহিরা অনুভব করলেন যে, মেঘের এই যে ছায়া প্রদান এর একটি বিশিষ্ট অর্থ আছে। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো অলৌকিক ইঙ্গিত আছে। তিনি তখন কাফেলার লোকজনকে তাঁর মন্দিরে খাদ্য গ্রহণ করবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। কোরাইশগণ মোহাম্মদকে উটগুলো দেখার জন্য গাছের তলায় রেখে নিজেরা মন্দির অভ্যন্তরে গেল। বাহিরা এদের মুখের দিকে তাকিয়ে অলৌকিক কিছু লক্ষ্য করলেন না। তিনি তখন কোরাইশগণকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কি আপনারা সবাই এসেছেন?

কোরাইশগণ বললেন , না একজন বালককে গাছের তলায় রেখে এসেছি।

বালক মোহাম্মদকে তখন বাহিরার মন্দিরে ডেকে আনা হল। বাহিরা মোহাম্মদের দিব্যকান্তি দেখে অভিভূত হলেন এবং তাঁকে নানাবিধ প্রশ্ন করে সিদ্ধান্ত এলেন যে, এই সেই অলৌকিক পুরুষ যাঁর আগমনের বার্তা তিনি তাঁর ধর্মগ্রন্থে পেয়েছেন।বাহিরা আবু তালিবকে জিজ্ঞেস করলেন, এ বালকের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি?

আবু তালিব বললেন, সে আমার সন্তান।

সাধু বাহিরা বললেন, এ বালক আপনার সন্তান হতে পারে না। এর পিতা জীবিত নেই।

আবু তালিব তখন বললেন, এ আমার ভ্রাতার পুত্র, আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার ভ্রাতা জীবিত নেই।

বাহিরা তখন বললেন, আপনার ভ্রাতার পুত্রকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং ইহুদীদের কাছ থেকে তাঁকে দূরে রাখুন। তাঁর বিপদের আশংকা আছে। আপনার ভ্রাতার পুত্রের জন্য একটি অসাধারণ ভবিষ্যৎ রয়েছে।

সমগ্র আরব দেশেই নয়, পৃথিবীর সকল মুসলমানদের মধ্যেই এই কাহিনী পরিচিত এবং বিশ্বাসের সঙ্গে আলোচিত। সত্যিই তো তিনি আলো--বিশ্বাসের আলো, চৈতন্যের আলো এবং আমাদের অস্তিত্বের আলো। এই আলোর উপমা রসূলে খোদার জীবন কথায় বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। তিনি নিজে একবার বলেছিলেন, "আল্লাহ্ তাঁর জ্যোতি দিয়ে আমাকে তৈরী করেছেন এবং আমার জ্যোতি দিয়ে বিশ্বভুবন সৃষ্টি করেছেন।" এই জ্যোতির্ময়তাই ইসলামের মূল সত্য। আমরা কাবা গৃহে যাই এই জ্যোতিকে অনুভব করার জন্য।

www.pathagar.com

আমি হারেম শরীফের ভেতরে প্রবেশ করে কেমন এক প্রকার তন্ময়তা অনুভব করলাম। হল বিশ্বের সমস্ত সম্পদ এখানে পুঞ্জীভূত হয়েছে এবং আমি সেই সম্পদকে স্পর্শ করতে ।। হারেম শরীফের চত্বরের মধ্যে অগণিত মানুষ পড়ে চলেছে, *লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা য়েক–হে আল্লাহ আমি তোমার নিকটে উপস্থিত, আমি তোমার সান্নিধ্যে উপস্থিত। আমি ার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এসেছি। তুমি একক ও অদ্বিতীয়। তোমার কোনো শরিক নেই। নন্দেহে সকল প্রশংসা তোমার এবং সমগ্র বিশ্বের একমাত্র আধিপত্য তোমার। হে প্রভু ার দাসানুদাস তোমার নিকটে উপস্থিত, তুমি তাকে গ্রহণ করো।*

মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে জামাতে আছরের নামাজ আদায় করলাম এবং তারপর গৃহে তাওয়াফ আরম্ভ করলাম। তাওয়াফের কতগুলো নিয়ম আছে সেগুলো সকলকে ত হয়। এই নিয়ম পালন করে তাওয়াফ কারার মধ্যে একটি আনন্দ আছে। বহু লোক ই প্রথায় কাবা গৃহে প্রদক্ষিণ করেছে। এর মধ্যে একটি সম্মিলিত সৌষ্ঠব আছে এবং ট মনোহারিত্ব আছে। তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করার সময় সকলেই বলে, *হে আল্লাহ তোমার ' আরম্ভ করছি এবং ঘোষণা করছি যে, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ। তুমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য এবং তুমিই সর্বজ্ঞ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমার রহমত এবং সালাম রসূলে খোদার উপর ত হোক এবং তাঁর সন্তান–সন্ততির উপরও বর্ষিত হোক। হে মহামহিম! তোমার অনুগ্রহ ' ভালো কাজ করার কোনো ক্ষমতা আমাদের নেই এবং মন্দ থেকে বেঁচে থাকবার না উপায়ও আমাদের নেই।*

প্রথম প্রদক্ষিণের সময় সকলেই বলতে থাকে, *হে আল্লাহ তোমার নামে কাবা গৃহে ক্ষিণ আরম্ভ করছি। তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তুমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, হে আল্লাহ ার উপর বিশ্বাস এনে, তোমার গ্রন্থের উপর বিশ্বাস রেখে তোমার কাছে প্রদত্ত অঙ্গীকার ার্থে তোমার প্রিয় নবী এবং বন্ধু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)–এর আদর্শ অনুসরণ করে আমি প্রদক্ষিণ করছি। আমি তোমার নিকট ইহকাল এবং পরকালের সুখ শান্তি এবং ক্ষমা না করছি।*

দ্বিতীয়বার প্রদক্ষিণের সময় সবাই বলে, *হে আল্লাহ ঈমানকে আমাদের নিকট প্রিয় করে ঈমানের সৌন্দর্যে আমাদের অন্তর পরিচ্ছন্ন করো, পৃথিবীর যাবতীয় পাপ আমাদের নিকট করে দাও এবং আমাদের সকলকে সত্য ও ন্যায়ের দলভুক্ত করো।*

www.pathagar.com

এভাবে সাতবার প্রদক্ষিণ করতে হয় এবং বিভিন্ন প্রদক্ষিণে একই প্রার্থনা বিভিন্ন পদ্ধতিতে উচ্চারিত হয়। কাবা প্রদক্ষিণের শেষে আল্লার কাছে আর্তি জানাতে হয়, প্রার্থনা জানাতে হয়। এ প্রার্থনা প্রত্যেক মানুষ আপন আন্তরিকতায় নিজের মতো করে করবে এটাই কাম্য। আমি হিজরে আসওয়াদ চুম্বন করে কাবা গৃহের দেয়ালে হাত রেখে একটি প্রার্থনা করেছিলাম, "হে আল্লাহ্ পৃথিবীর সকল ক্ষেত্রে যখন বঞ্চনা, যখন অভিশাপ-অস্বাচ্ছন্দ্য তখন তুমি আমাকে কাবা গৃহ প্রদক্ষিণের সুযোগ দিয়েছো। এখানে আমি একটি অনন্তকালীনতার সাক্ষী হয়েছি, একটি পরিচ্ছন্নতার সাক্ষী হয়েছি। হে পবিত্র গৃহের অধিকর্তা, তুমি আমাকে এবং আমার পূর্বপুরুষ সকলকে এবং আমার সন্তান-সন্ততিকে অপরাধ এবং পাপ থেকে মুক্তি দাও। তুমি দয়ালু, দাতা, করুণাময়, হিতকারী ও মঙ্গলময়, আমার প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডকে শোভন এবং সুন্দর করে দাও। ইহকালের অপমান থেকে এবং পরকালের শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করো। আমি আজ তোমার করুণাপ্রার্থী হয়ে তোমার সান্নিধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছি, আমার প্রার্থনা এই-- আমি জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে যে সমস্ত পাপ করেছি এবং যে সমস্ত স্খলনকে এড়াতে পারিনি সেগুলো থেকে আমাকে মুক্ত করো, আমার কর্মকে সঠিক করো, আমার অন্তরকে পবিত্র করো, আমার ভবিষ্যতকে আলোকিত করো এবং আমাকে শুভ ও কল্যাণের প্রকোষ্ঠে উপস্থিত করো।"

কাবা গৃহের নিকটেই মকামে ইব্রাহীম। মকামে ইব্রাহীম একখন্ড পাথর। এই পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে হজরত ইব্রাহীম পুত্র ইসমাইলের সাহায্যে কাবা গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। এই পাথরের উপর হযরত ইব্রাহীমের পদচিহ্ন অংকিত আছে। বর্তমানে কাবা গৃহ থেকে কিছুটা দূরে একটি কাঁচের গম্বুজের মধ্যে এটি রক্ষিত। মকামে ইব্রাহীমের নিকট উপস্থিত হয়ে দু'রাকাত নামাজ পড়ে আমি সায়ী করতে গেলাম। সায়ী হচ্ছে সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত সাতবার পদব্রজে গমন। বিবি হাজেরা তাঁর সন্তানের পিপাসা নিবারণের জন্য পানির সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে একবার সাফা পবর্তের উপরে উঠেছিলেন এবং আর একবার দৌড়ে গিয়ে মারওয়া পর্বতের উপরে উঠেছিলেন। এভাবে সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত তিনি ছুটোছুটি করেছিলেন। হাজেরার মাতৃহৃদয়ের আকুলতার প্রতীক হিসাবে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বিশ্বাসিগণ সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে সাফা পর্বতে দৌড়ে যান। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো জাতি রমণীকুলকে এহেন সম্মান দেখায় নি।

বিবি হাজেরা মাতা ছিলেন এবং মাতা হিসাবে সন্তানের জন্য তাঁর একটি আকুলতা এবং প্রার্থনা ছিল। অনন্তকাল ধরে সেই আকুলতা এবং প্রার্থনার কথা বিশ্বাসিগণ স্মরণ করে চলেছে। এই শ্রদ্ধা মাতৃহৃদয়ের করুণার প্রতীক, মাতার আকুলতার প্রতীক এবং মমতার প্রতীক। এই অতুলনীয় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন সকলকে স্তম্ভিত করে। শ্রদ্ধার এই বিশালতা, বিপুলতা এবং সর্বকালীনতার তুলনা নেই। সাফা পর্বতের উপর উঠে সকল বিশ্বাসীকে প্রার্থনা করতে হয় ও

www.pathagar.com

বলতে হয়, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে দয়া করো, আমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করো, তোমার অনুগ্রহের সমস্ত কপাট আমার জন্য খুলে দাও, বিফলতা এবং অসম্মান থেকে আমাকে রক্ষা করো।

সাতবার যে সায়ী করতে হয় সেই সায়ীর প্রতিবারের জন্য একটি করে দোয়া আছে। সাধারণত দলের একজন উচ্চ স্বরে এসব দোয়া পড়তে থাকেন এবং তাঁর সঙ্গীরা তাঁর সাথে সাথে কথাগুলো উচ্চারণ করেন। এতে একটি সুন্দর কলগুঞ্জন প্রবাহিত হতে থাকে। সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত এই এলাকাটি সুন্দর একটি বিস্তারিত ও প্রশস্ত মর্মর প্রস্তরে নির্মিত অট্টালিকার মধ্যে বর্তমানে অবস্থিত এবং সম্পূর্ণ কক্ষটি পুরোপুরি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের নির্দশনস্বরূপ মূল পাহাড়ের কিছু অংশ প্রোথিত রাখা হয়েছে যে অংশ দুটো সমতল থেকে একটু উঁচু। মানুষ যখন সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত আল্লার নাম উচ্চারণ করতে করতে দ্রুতবেগে ধাবমান হতে থাকে তখন সংসারের কোনো শব্দই সে শুনতে পায় না। পৃথিবীর সকল ইচ্ছাকেই সে বিসর্জন দেয় এবং একটি অনন্ত তন্ময়তায় সে নিমগ্ন হয়। একজন মানুষের জীবনে এ অভিজ্ঞতার তুলনা নেই। কবে কোন্ অতীতে একটি আকাংখিত মাতৃহৃদয় সন্তানের জন্য শুভাশীষ সন্ধান করেছিলেন আজো ব্যাকুল হয়ে আমরা তার অনুকরণ করে চলেছি। বিপুল বিশ্বের মানুষ একটি আকাংখায় এখানে মিলিত হয়েছে। সে আকাংখা শান্তির এবং পাপ মুক্তির। সে আকাংখা গ্লানি থেকে নিষ্ক্রমণের, সে আকাংখা অস্বাচ্ছন্দ্য থেকে মুক্তির।

এক সময় এ অঞ্চল ধূলিধূসরিত রুক্ষ পর্বতসংকুল ছিল। তখন মানুষ সূর্যতাপে পরিশ্রান্ত হয়ে এই পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ করত। পায়ের তলায় উত্তপ্ত বালু তাকে পীড়িত করত। প্রস্তর কণাগুলো মানুষের পায়ের আঘাতে ছুটে যেতো চতুর্দিকে। অদূরে অপেক্ষমান উটের নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যেতো। সে সময় মানুষ যে কষ্ট সহ্য করেছে আজকের দিনে আমাদের পক্ষে তা অনুভব করা অসম্ভব। আমরা আধুনিক জীবনের সর্বপ্রকার সৌজন্যকে গ্রহণ করে কাবা গৃহ প্রদক্ষিণ করছি এবং সাফা মারওয়ার পথে পদযাত্রা করছি। আমার কল্পনায় চিরকাল যে বিপুল মরুভূমিতে মানুষ বিপদসংকুলতায় তার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করত সে চিত্রটাই ভেসে ওঠে। ১৯৫৪ সালে আমার পিতা হজ্জ করতে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে পথের কষ্টের বিবরণ দিয়েছিলেন। জনতার চাপে প্রাণ সংশয়ের কথা বলেছিলেন। কিন্তু সমস্ত কিছু অতিক্রম করে একটি অপরিসীম তৃপ্তির কথা বলেছিলেন। আমার কল্পনায় দুর্ভরতার সুকঠিন পরীক্ষার শেষে শান্তির বরাভয়ের একটি চিত্র ছিল। সে চিত্র ভবিষ্যতে আর কখনো জাগ্রত করা যাবে না। এখনকার দিনে পুরনো দিনের অবস্থা কল্পনা করা অসম্ভব। হয়তো সেগুলোর প্রয়োজনও নেই।

এভাবে ওমরাহ যখন শেষ হল তখন আমি মাথা কামিয়ে ফেললাম। এটাই রীতি। কেশরাশির বিলাস থেকে এই মুক্তি মানুষকে সংসারের দুর্বলতা থেকে রক্ষা করে। ওমরাহর

www.pathagar.com

সময় আরাফাত–মীনা ময়দানে যেতে হয় না। কিন্তু আমি পরের দিন আরাফাত এবং মীনা দেখতে গিয়েছিলাম। আরাফাতের নিকটে জেবল রহম অর্থাৎ শান্তির পর্বত রয়েছে। এই পর্বতের নিকটে দাঁড়িয়ে রসূলে খোদা তাঁর জীবনের শেষ খুতবা দিয়েছিলেন। পর্বতটি সুরক্ষিত। ঘোরানো সিঁড়ি করে দেওয়া আছে। সেই সিঁড়ি বেয়ে মানুষ পর্বতের শীর্ষদেশে উঠতে পারে।

হিজরী নবম বর্ষের শেষাংশ এবং দশম বর্ষ রসূলে খোদা অতিবাহিত করেন ইসলাম গ্রহণকারী মদিনায় আগত বিভিন্ন প্রতিনিধিবর্গের সংবর্ধনায়। তিনি এক পর্যায়ে হজ্ব আদায়ের কথা ঘোষণা করেন। হিজরী দশম বর্ষে পঁচিশে জিলকদ হজ্জ ও ওমারার উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী সঙ্গীগণকে সঙ্গে নিয়ে মক্কার পথে মদিনা ত্যাগ করেন। আটই জিলহজ্জ রসূলে খোদা মীনা অভিমুখে যাত্রা করেন। মীনায় পৌঁছে সেখানে তাঁবু পাতেন এবং রাত্রি যাপন করেন। পরের দিন নয়ই জিলহজ্জ ফজর নামাজের পর উষ্ট্রীতে আরোহণ করে আরাফাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। লক্ষাধিক লোক তাঁকে অনুসরণ করে। আরাফাতের পাহাড় জেবল রহমের কাছে তাঁর উষ্ট্রী এসে থামে। উষ্ট্রীর পিঠে অবস্থানরত অবস্থায় থেকেই রসূল তাঁর বিখ্যাত বিদায় হজ্জের ভাষণ প্রদান করেন। প্রান্তরে, পাহাড়ের সানুদেশে, উপত্যকায় সর্বত্র বিপুল জনারণ্য। 'আল্লাহ্ আকবার' সমস্বরে উচ্চারিত হবার পর রাসূলে খোদা তাঁর ভাষণ দিলেন। তিনি এক একটি বাক্য বললেন এবং তাঁর একটু নীচে অবস্থানরত রাবিয়া ইবনে উমাইয়াতা সে বাক্যটি সকলের শ্রবণযোগ্য করে পুনরাবৃত্তি করলেন। তিনি বললেন, *হে বিশ্বাসিগণ, আমার কথা শোন। সম্ভবত এরপর তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ নাও হতে পারে। হে জনমন্ডলী, তোমাদের পরস্পরের জান–মাল পরস্পরের জন্য হারাম বা পবিত্র সাব্যস্ত করা হল কিয়ামত পর্যন্ত যেমন এই মাস এবং এই দিনকে পবিত্র করা হয়েছে। নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লার সাথে মিলিত হবে যিনি তোমাদের আমল ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবশ্যই প্রশ্ন করবেন। আমার পক্ষ থেকে আমি এ কথা জানিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের কারও কাছে গচ্ছিত আমানত মওজুদ থাকলে তা মালিকের নিকট পৌঁছে দেবে। আজ থেকে সকল প্রকার সূদ নিষিদ্ধ করা হল। তোমরা কেবল নিজ নিজ মুনাফা ফেরৎ পাবে যাতে অন্যায় অবিচারের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকবে না। তোমরা অন্যকে নির্যাতন করবে না এবং নিজেরাও নির্যাতিত হবে না। স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে এবং তোমাদের উপর স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে। নারীদের উপর সদ্ব্যবহার করবে এবং শিষ্টাচার বজায় রাখবে।*

এ সময় আল্লার পক্ষ থেকে সর্বশেষ ওহী বা প্রত্যাদেশ এল, 'আলইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়াত্মামতু আলাইকুম নেয়মাতি ওরাজিইতু লাকুমুল ইসলাম দ্বীন।" অর্থাৎ "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের জীবনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।"

আমি জেবল রহম থেকে একখণ্ড ছোট পাথর কুড়িয়ে আনতে চেয়েছিলাম। ইতস্ততঃ নানা আকারের নুড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তার মধ্য থেকে একটি তুলে নিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের

www.pathagar.com

সঙ্গী হেলাল নামক একজন বাঙালী যুবক পাথরটি আমার হাত থেকে নিয়ে পাহাড়েই রেখে দিল। বললো, "এখান থেকে নিয়ে গেলে পাথরের টুকরাটি দুঃখ পাবে। বলবে, আমাকে একটি পবিত্র স্থান থেকে সরিয়ে এনেছ। তা ছাড়া টুকরোটি দেশে নিয়ে গিয়ে কি করবেন ? পবিত্র জ্ঞানে সম্মান জানাবেন তো? সেটা ঠিক হয় না।" হেলাল মক্কা শরীফের একটি মসজিদে ইমামতি করে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মীয় বিষয়ে একজন নিয়মিত বিদ্যার্থী। তাওয়াফ এবং সায়ীর সময় সে আমাদের সঙ্গে ছিল এবং দোয়া দরুদ উচ্চ স্বরে পড়েছে।

আরাফাত থেকে হেরা পাহাড় দেখতে গেলাম। এখানে সে পাহাড়কে বলে জেবল আল নূর অর্থাৎ জ্যোতির পাহাড়।রসূলে খোদা ছিলেন সকল জ্যোতির উৎস এবং একদিন এ পর্বতে অফুরন্ত জ্যোতির বন্যা নেমেছিল। পৃথিবী সেই মুহূর্তে অকস্মাৎ যেন স্তব্ধ হয়েছিল। একটি বিপুল এবং বিস্ময়বিমূঢ় শান্ত পরিবেশে একটি নতুন অভ্যুদয়ের প্রত্যাশা উন্মুখ হয়েছিল। একজন বিনয়নম্র, দীপ্তোজ্জ্বল, ব্যক্তিত্বে সুনিশ্চয়, প্রজ্ঞায় প্রশান্ত এবং সুনির্দিষ্ট পুরুষ ছিলেন এ পর্বতের নিত্য সঙ্গী। পর্বতের শিরোদেশে একটি গুহার অভ্যন্তরে দীর্ঘ সময় যিনি একাকী অবস্থান করেছেন। এখানে অবস্থান কালে একদিন প্রত্যাদেশ এলো। তাঁর প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির প্রভাময় মুহূর্তকে অপূর্ব ভাষায় বর্ণনা করেছেন ইরানের প্রখ্যাত পণ্ডিত জয়নুল আবেদীন রাহনুমা।

১৯৫৭ সালে রাহনুমাকে আমি প্রথম দেখি তেহরানে। তখ্‌তে জামশিদে অবস্থিত একটি হোটেলে আমি ছিলাম। রাহনুমার পরিচয় জেনেছিলাম বৈরুতের নবিহ আমিন ফারিসের কাছ থেকে। খবর দিতেই আমার হোটেলে এলেন সৌম্যদর্শন, হাস্যোজ্জ্বল শ্মশ্রুমণ্ডিত পুরুষ। তিনি আমাকে তাঁর রচিত 'পয়গম্বর' বইটি উপহার দেন। সম্প্রতি ঢাকায় রাহনুমার বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আমি সেখান থেকেই নবুয়ত প্রাপ্তির বর্ণনাটি তুলে দিচ্ছিঃ

মক্কার চতুর্দিকে কৃষ্ণকায় রুক্ষ পাহাড়ের সারির উপর প্রভাতের উজ্জ্বলতা প্রতিফলিত হবার পূর্বেই হেরা পর্বত থেকে একজন পুরুষ শান্ত সতর্কতার সাথে বেরিয়ে এলেন। প্রভাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে বেরিয়ে এসে তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। তিনি শুধু একটি বস্তুকেই দেখছিলেন। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল আকাশের সীমারেখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা এক ফেরেস্তার উপর। ফেরেস্তার বিস্তারিত পাখা দুটি ছিল বিদ্যুতের ঔজ্জ্বল্যে প্রদীপ্ত এবং পা দুটি ছিল ভূমিপৃষ্ঠে স্থাপিত। তাঁর দৃষ্টি ছিল অসাধারণ তীক্ষ্ণ জ্যোতিচ্ছটার। বিহ্বল মুহাম্মদ তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। প্রত্যুষের আকাশে আকস্মাৎ দৃষ্টিগোচর স্বর্গীয় দূত বলে উঠলেন, "মুহাম্মদ, আপনি এখন আল্লার বাণীবাহক পয়গম্বর।" এর কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি যখন হেরার গুহার অভ্যন্তরে জিবরাইল তাঁর কাছে প্রথম ঐশী বাণীর সংবাদ এনেছিলেন। বলেছিলেন, "পাঠ কর।" তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "আমিতো পাঠ করতে জানি না।" তখন ফেরেস্তা তাঁকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছিলেন। ছেড়ে দিয়ে আবার বলেছিলেন, "পাঠ কর।" পুনর্বার রসুল বলেছিলেন, "আমিতো পাঠ করতে জানি না।" ফেরেস্তা

www.pathagar.com

বার তাঁকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছিলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বলেছিলেন, "পাঠ কর।" তিনি খন প্রশ্ন করেছিলেন, "কি পাঠ করব?" ফেরেস্তা তখন বলেছিলেন, "পাঠ কর তোমার প্রভুর মে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, জমাট রক্ত থেকে যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পাঠ কর, ননা তোমার প্রভু পরম কল্যাণময় যিনি লেখনীর প্রয়োগ শিখিয়েছেন, যিনি মানুষকে তাই খিয়েছেন যা মানুষের অজ্ঞাত ছিল।"

এভাবে পরমতম স্বীকৃতিতে বিশ্বপ্রভুর বাণীবাহক হয়েছিলেন মুহাম্মদ। এবং সেদিন কেই তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

এরপর ফিরে এসেছিলাম হারাম শরীফে। প্রবল আলোর বন্যায় উদ্ভাসিত অজস্র পুরুষ ও ণী কাবা গৃহ পরিক্রমণ করছে। আমারও তাদের সঙ্গে যোগ দিলাম। তাওয়াফ শেষে কাবার য়ালে হাত রেখে সকল পাপের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করলাম এবং হৃদয়ের আর্তি নিবেদন লাম। সবশেষে কাবার দেয়ালের দিকে মুখ রেখে নফল নামাজের সিজদায় মাথা নত লাম। নামাজ শেষে বসে আছি এমন সময় জনৈক আরবী মহিলা আমাদের ডিঙ্গিয়ে কাবার য়াল স্পর্শ করতে এগিয়ে গেল। তাকে এভাবে এগিয়ে যেতে কর্তব্যরত প্রহরী বলে উঠলো, ুমি কেমনতরো নির্লজ্জ মহিলা যে, পুরুষদের ডিঙিয়ে চলে যাও।" মহিলাটিও সঙ্গে সঙ্গে র দিল, "তুমি কেমনতরো নির্লজ্জ পুরুষ যে, মহিলাকে সম্মান করে কথা বলতে জানো ?"

এর একটু পরে এশার নামাজ শেষ করে বাসায় ফিরে এলাম।

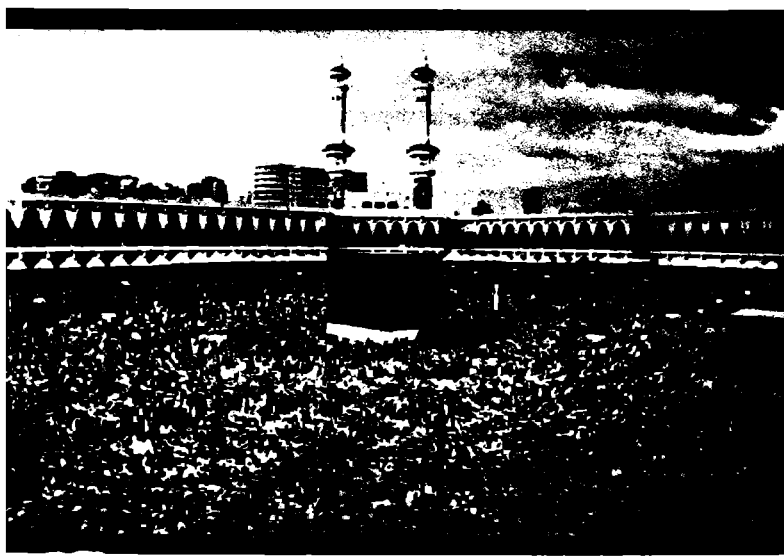

www.pathagar.com

মরুভূমির দেশে সূর্যতাপের ভয় আছে, ঝালুকাঝড়ের ভয় আছে। সুতরাং গৃহ নির্মাণের ্য অন্তরাল খুঁজতে হয় তাপ থেকে এবং ঝড়ের উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা থেকে। তাই সেসব লের বাড়ী-ঘরের বারান্দা নেই, জানালাও অনেকটা না থাকার মতো। এর ফলে বিশেষ নর গৃহ নির্মাণ আঙ্গিক সেখানে গড়ে উঠেছে, যাকে আমরা ভারনাকুলার বা দেশজ ভাষ্য তে পারি। আরব স্থাপত্য সম্পর্কে বলতে গেলে এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। ভূমিতে বেদুঈনদের বাসগৃহ হচ্ছে তাঁবু যার চতুর্দিকে আবরিত এবং ছাদ হিসাবে এক র ছুঁচালো বা কৌণিক আচ্ছাদন থাকে। গৃহনির্মাণে এ আকৃতিটি এখানকার আঞ্চলিক জ ভাষ্য। চতুর্দিকের খোলা প্রান্তর থেকে বিচ্ছিন্নকরণের মাধ্যমে তাঁবুর অভ্যন্তরস্থ অংশ ষ্টি দ্যোতনা লাভ করে। পবিত্র কাবাগৃহের আকৃতিটি লক্ষ্য করবার বিষয়। চতুষ্কৌণিক এ র কোথাও জানালা নেই। একটি দরজা আছে মাত্র। কিন্তু ছাদটি সমান্তরাল। তাঁবুর ছাদের নয়। এভাবে কাবা গৃহটিও এ অঞ্চলের স্থাপত্য শিল্পের দেশজ ভাষ্য। বর্তমানে মক্কায় যে ঃ গৃহ নির্মিত হচ্ছে সেগুলোর নিজস্ব এলাকাকে সীমাবদ্ধ করে অভ্যন্তরীণ শোভায় সমৃদ্ধ। রে থেকে এগুলো দুর্গের মতো মনে হয়। জানালা নেই, অনেক উঁচুতে বায়ু প্রবেশের পথ ছ কিন্তু তাও বন্ধ থাকে। যেহেতু শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এদেশে সর্বজনীন, সুতরাং লার প্রয়োজন হয় না। গৃহের যত কিছু কারুকার্য তার অধিকাংশ অভ্যন্তরভাগের। নতুন গৃহে বহিরাঙ্গের শোভা আছে কিন্তু মূলত আরব দেশের স্থাপত্য 'আশ্রয় স্থান' বা শেল্টার ক একটি দেশজ ভঙ্গী থেকে গড়ে উঠেছে। কাবা গৃহের আকৃতি থেকেই আরব দেশের ভূমির তাঁবু অথবা খেজুর পাতার ছাউনীর ঘর তৈরী হয়েছে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কাবা একই সঙ্গে যেমন একটি গৃহ তেমনি একটি বিমূর্ত ভাস্কর্য। গৃহটির আকৃতিতে কোথাও মাণগত হেরফের নেই। বিন্যাসগত ব্যতিক্রম নেই। একটি চতুষ্কৌণিক কিউব একটি র্যের নিশ্চয়তায় দণ্ডায়মান রয়েছে।

হযরত মাবিয়ার মৃত্যুর পর মক্কা শরীফের অধিকার নিয়ে সংঘর্ষ বাঁধে। ইবনে জুবায়ের ন্নকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন। মাবিয়ার পুত্র ইয়াজিদ পিতার মৃত্যুর পর খেলাফতে ষ্ঠিত ছিলেন। ইয়াজিদ ৬৮৩ খৃষ্টাব্দে ইবনে জুবায়েরকে বিদ্রোহী ঘোষণা করে মক্কা রোধ করেন। অবরোধকালে কাবা গৃহ আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়। এর প্রতিফল ইয়াজিদকে সঙ্গেই পেতে হয়েছিল-কাবা গৃহ ভস্মীভূত হবার পনর দিনের মধ্যেই ইয়াযিদের মৃত্যু

www.pathagar.com

হয়। তখন ইবনে জুবায়ের মক্কায় নিজেকে খলিফা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে কাবা গৃহ পুনঃনির্মাণ করেন।

স্থাপত্যের কৌশলের দিক থেকে কাবা গৃহ নির্মল, নিশ্চিন্ত, পরিচ্ছন্ন এবং অফুরন্ত বিনয় ও প্রেমের উৎস। এই বিনয় এবং প্রেমের সমর্থনে কাবা গৃহ মর্যাদাবান এবং ইসলামী উম্মাহ্‌র সকল প্রেরণার কেন্দ্রভূমি। হারাম শরীফের আলোকিত বিপুল চত্বরের মাঝখানে পবিত্র কাবার অবস্থিত গৃহটিকে একটি অলৌকিক আকর্ষণে মণ্ডিত করেছে। হারাম শরীফের বিপুল চত্বরের উন্মুক্ততা কাবা গৃহটিকে এমনভাবে বেষ্টন করে রেখেছে যে, সহজেই এই উন্মুক্ত এলাকার সঙ্গে কাবা গৃহের স্থাপত্যগত একটি সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। কাবা গৃহের অভ্যন্তরভাগ উন্মুক্ত নয়। কিন্তু চতুর্দিকের উন্মুক্ততা এবং উর্ধ্বাকাশের উন্মুক্ততা কাবা গৃহকে একটি বিপুল উন্মুক্ততার অংশভাগী করেছে। এককভাবে গৃহটি কোনো বিশেষ পার্থিব শিল্পকুশলতা বহন করে না, কিন্তু হারাম শরীফের বিপুল চত্বরের মাঝখানে গৃহটিকে একটি অলৌকিক অবস্থিতি বলে বিশ্বাস জন্মে। কাবা গৃহটি যখন পুনঃনির্মিত হয় তখন এ গৃহ নির্মাণের সময় পারস্য দেশের স্থপতিরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলে কিতাব-আল-আগানীতে উল্লেখ আছে। সে সময় কাবা গৃহের দেয়াল ছিল দু'হাত চওড়া ও গৃহের উচ্চতা ছিল ২৭হাত। কাবা গৃহের দরোজাটি ভূমি থেকে ১১ হাত উঁচুতে। ৬৩৮ সালে হযরত ওমরের সময় প্রথম কাবা গৃহের চতুর্দিকে উন্মুক্ত চত্বরের ব্যবস্থা করা হয়। এর পূর্বে চতুর্দিকে বাসগৃহ ছিল। হযরত উমর প্রথম হাজীদের সংখ্যা বৃদ্ধির কথা চিন্তা করে চতুর্দিকের বাড়ীগুলো ভেঙ্গে হারাম শরীফের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই উন্মুক্ত স্থানটি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে এই উন্মুক্ত এলাকাটি হজ্জের সময় বহু লক্ষ মানুষের অবস্থানের অনুকূল হয়েছে। উন্মুক্ত স্থানের চারদিকে একটানা আবরিত স্থান নির্ধারিত হয়েছে। এই স্থানগুলো বহুবিধ খিলানের সাহায্যে অপূর্ব শোভামণ্ডিত। সুউচ্চ মিনারগুলো বিপুল আলোকসম্ভারে সজ্জিত থাকে এবং রাত্রিবেলা অসম্ভব গরম হয় বলে দিনের তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে ঘন পর্দা টেনে কাঁচ ঢেকে রাখতে হয়। তখন আবার বিদ্যুৎ বাতি জ্বালাতেই হয়। সুতরাং এক কথায় বলা যায় প্রকৃতি এবং আবহাওয়ার নির্দেশেই এখানকার বাসস্থানগুলো বিশিষ্ট আকৃতি পেয়েছে।

আবরদেশের ভাস্কর্য নেই। থাকতেও পারে না, কিন্তু বর্তমানে কোনো কোনো চৌরাস্তার মোড়ে অথবা দীর্ঘ পথের পাশে কিছু কিছু ভাস্কর্য স্থাপিত হচ্ছে। জেদ্দা থেকে মক্কা শহরে প্রবেশের মুখে একটি ভাস্কর্য নিদর্শন আছে-কয়েকটি পানির সরাহির আকৃতির একটি সমন্বয়। আর এক স্থানে চৌরাস্তার মোড়ে একটি ছোট মিনারের আকৃতি বসানো হয়েছে। অন্য একটি পথের বাঁকে কয়েকটি পিলার বিমূর্তভাবে সাজানো আছে। জেদ্দা থেকে গাড়ী করে মক্কা শরীফে যেতে ডান দিকে একটি বিশাল এলাকা জুড়ে একটি বিশিষ্ট আকৃতি গড়ে উঠছে দেখলাম। সেটি সম্পূর্ণ হলে মনে হবে যেন একটি খোলা রেহেলের ওপর একখন্ড কোরান শরীফ রাখা হয়েছে। এভাবে দেখা যায় যে, আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবিশ্বাস এবং দেশজ ভঙ্গিকে

www.pathagar.com

স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে মূর্ত করার চেষ্টা চলছে।

মক্কা শরীফে এবং মদিনা শরীফে মসজিদগুলোর বৈশিষ্ট্য তাদের অসাধারণ সুন্দর মিনারের জন্য। তুরস্কের মসজিদের বৈশিষ্ট্য যেমন গম্বুজের জন্য, আরব দেশের মসজিদের বৈশিষ্ট্য সে ক্ষেত্রে মিনারের জন্য। হারাম শরীফে কোন গম্বুজ নেই। কিন্তু সুউচ্চ এবং সুদৃশ্য কয়েকটি মিনার রয়েছে। কিবলামুখী বলে মসজিদগুলো এক এক এলাকায় এক এক ভঙ্গিতে নির্মিত। কোনো মসজিদের কিবলা পশ্চিম দিকে, কোনোটির উত্তর দিকে, কোনোটির দক্ষিণ দিকে, এ রকম। বিদেশীদের কাছে প্রথম হঠাৎ এটা বুঝতে অসুবিধা লাগে। অবশ্য অল্পক্ষণেই তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়।

গৃহনির্মাণে প্রস্তর এবং ইটের ব্যবহার একটি স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক নিয়ম। এদেশে প্রস্তরের অভাব নেই। মক্কা থেকে মদিনার পথের দু'পাশে পর্বতশ্রেণী চোখে পড়ে।

মক্কা এবং মদিনা প্রত্যেক মুসলমানের ভালো লাগে একটি ভালোবাসার কারণে। আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসা এ দু'টি নগরীকে অনন্তের প্রতি আসক্তির কেন্দ্রভূমি করেছে। যেমন পৃথিবী এবং বৃষ্টি একে অন্যকে কামনা করে। যেমন নদী এবং সমুদ্র একে অন্যের, যেমন রাত্রি এবং দিবস একে অন্যের প্রতি সমর্পিত তেমনি পৃথিবীর সকল বিশ্বাসী মানুষ এ দুটি নগরীর প্রতি নিবেদিত এবং নগরী দুটিও উম্মাহর সকল প্রাণকে আকর্ষণ করছে। মওলানা জালালউদ্দিন রুমী বলেছেন যে, প্রিয়তমার আকর্ষণ না থাকলে প্রিয়তমের আকর্ষণ গড়ে ওঠে না। যখন প্রেমের বিদ্যুৎ প্রবাহ হৃদয়ে প্রবেশ করে তখনই হৃদয় প্রেমের আধার হয়। যখন আল্লার প্রতি ভালোবাসা হৃদয়কে প্রসারিত করে তখন মনে রাখবে আল্লাহও তোমাকে ভালোবাসছেন। একাকী একটি হাত কখনো তালি দিতে পারে না। তালির শব্দের জন্য দুটি হাতের প্রয়োজন। ঐশ্বরিক যে জ্ঞান সে জ্ঞানের সাহায্যেই আমরা ভালোবাসতে শিখি। আল্লার নির্দেশ আছে বলেই পৃথিবীর সর্বত্রই যুগ্মতা বিরাজমান। আকাশ হচ্ছে পুরুষ এবং ধরিত্রী হচ্ছে রমণী। আকাশ যা বর্ষণ করে ধরিত্রী তা ধারণ করে। যখন মৃত্তিকায় তাপ থাকে না তখন আকাশে বহু দূর থেকে আলোর অভিষেক লক্ষ্য করা যায়।

ইসলামী স্থাপত্যের নিদর্শন হিসাবে মদিনা শরীফের মসজিদটি প্রথম বলিষ্ঠ নিদর্শন। ৬২২ খৃষ্টাব্দে মদিনা শরীফে মসজিদে নববী নির্মিত হয়। এই মসজিদ রসূলে খোদার বাসগৃহকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। মসজিদে নববী ইসলামী স্থাপত্য শিল্পে পৃথিবীতে প্রথম নিদর্শন। তবে এর পূর্বে কুবা মসজিদ নামে খ্যাত অন্য এক মসজিদের কথা উল্লেখ করতে হয়। মক্কা শরীফ থেকে মদিনা শরীফে হিজরতের পথে রসূলে খোদা কুবা অঞ্চলে চারদিন অবস্থান করেছিলেন। এই কুবাতে তখন নামাজ পড়বার জন্য যে স্থানটি নির্দিষ্ট হয়েছিল সেখানেই পরবর্তীকালে কুবার বিখ্যাত মসজিদ নির্মিত হয়। ৬২২ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর মক্কা শরীফ থেকে মদিনা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে রসূলে খোদা ২৪শে সেপ্টেম্বর কুবায় পৌছান। মদিনায় পৌছে রসূলে খোদা প্রথমেই একটি বাসগৃহ নির্মাণ করেন। তিনি তাঁর বাসগৃহের স্থান

www.pathagar.com

নির্বাচনের জন্য তাঁর উটকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই উট অগ্রসর হয়ে বিশ্রামের জন্য যেখানে থেমেছিল সেখানেই রসূলে খোদা তাঁর বাসগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। উট যেখানে থেমেছিল সেই জমি ছিল নাজার গোত্রের সাহাল ও সোহায়েল নামক দুই এতিম বালকের জমি। রসূলে খোদা উক্ত জমি ক্রয় করেন এবং সে জমিতে তাঁর বাসগৃহ এবং মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেন। এই বাসগৃহ এবং মসজিদ নির্মাণে সাত মাস বা তার অধিক সময় লেগেছিল। প্রথমে এই বাসগৃহ এবং মসজিদ অতি সাধারণভাবেই নির্মিত হয়েছিল। এতে কোনো ছাদ ছিল না শুধু দেয়াল ছিল। পরে সামনের দিকে আংশিকভাবে ছাদ নির্মিত হয়। বর্তমানে এই মসজিদটি পৃথিবীর একটি অন্যতম দর্শনীয় স্থাপত্য। মসজিদে প্রবেশের জন্য কয়েকটি দরোজা ছিল। তার একটি দরোজা বাব জিব্রিল নামে বিখ্যাত। হযরত জিব্রাইল (আঃ) এই দরোজা দিয়ে রসূলে খোদার গৃহে প্রবেশ করতেন বলে এটাকে বাব জিব্রিল বলা হয়। বর্তমানে মসজিদটি বিস্ময়করভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে এবং এক সঙ্গে মসজিদের অভ্যন্তরে লক্ষাধিক মানুষ যাতে নামাজ পড়তে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্মাণের বৈশিষ্ট্যে এ মসজিদটি একটি অনন্যসাধারণ শিল্প প্রজ্ঞার নিদর্শন বহন করে।

আরব দেশে বর্তমানে আধুনিক স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন অনেক গড়ে উঠেছে কিন্তু দেশজ ভঙ্গির মৌলিক আবহ বিদ্যমান রাখবার একটি চেষ্টা সেখানে লক্ষ্য করা যায়। মক্কা শরীফে এবং মদিনা শরীফে বহুতলবিশিষ্ট কয়েকটি ফ্ল্যাট বাড়ীতে গিয়েছিলাম। সেখানে সাধারণত গৃহের অভ্যন্তর ভাগেই সকল কিছু সৌন্দর্য এবং ব্যবস্থাপনা। বাইরের দিক থেকে প্রায় পুরোপুরি আবদ্ধ। দিনের বেলায়ও ভেতরের কক্ষগুলোতে বিদ্যুৎ বাতি জ্বালিয়ে গৃহকে আলোকিত রাখতে হয়। বাইরের আলো ভেতরে গমন করবার ব্যবস্থা খুব কম গৃহেরই আছে। কিছু কিছু নতুন বাড়ী তৈরী হয়েছে যেগুলোকে ওয়ান ইউনিট বাড়ী বলা যায়। সেসব বাড়ীতে রাস্তার দিকে কাঁচের দেয়াল আছে। কাঁচের দেয়াল মানে খোলা জানালার পরিবর্তে কাঁচের আবরণ নির্মাণ করা হয়েছে। দিনের বেলা এই কাঁচের আবরণ ভেদ করে বাইরের আলো প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু কাঁচ থেকে আবার তাপ নামে।

যখন মৃত্তিকায় সিক্ততা থাকে না তখন আকাশ সেই সিক্ততা এনে দেয়। আকাশ যখন সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত, সে ধরিত্রীকে সুফলা এবং প্রাণবন্ত করতে চায়। মনে হয় আকাশ এবং মৃত্তিকা একে অন্যের লাবণ্যে সিঞ্চিত এবং অভিষিক্ত। পৃথিবী না থাকলে কোথায় পুষ্প থাকত, কোথায় বৃক্ষ মুকুলিত হত? আল্লাহ মানুষের চিত্তে আকাংখা জাগরূক করেছেন এবং আকাংখার কারণে মানুষ প্রতিনিয়ত আল্লার কাছে প্রত্যাবর্তন করতে চায়।

কাবার চত্বরে এসে অজস্র মানুষের সঙ্গে আমি যখন বললাম, আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি এসেছি, আমি উপস্থিত, তখন মনে হল অনন্তকাল ধরে এই উপস্থিতির জন্য পরম বিধাতাও অপেক্ষা করছিলেন। আমার মনে হল যুগ যুগ ধরে মানুষের তৃষ্ণা আল্লার সান্নিধ্যে উপনীত হবার। সংসারে নানাবিধ সমস্যা তাকে ব্যতিব্যস্ত এবং ব্যাপৃত রাখে। সে তাই

www.pathagar.com

ম বিধাতার কাছে তার আর্তি নিবেদন করতে পারে না। বিধাতা যখন আহ্বান করেন ত
তার কাছে উপস্থিত হয়। সে তার সর্বস্ব ত্যাগ করে উপস্থিত হয়। মৃত্যুর পোশাক পা
র, সংসারের চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত করে সে বিশ্ববিধাতার দরবারে দণ্ডায়মান হয়ে
লতায় বলে, "হে প্রভু আমি উপস্থিত, আমাকে গ্রহণ করো, আমার দুর্বলতাসহ আ
ণ করো, আমার জীর্ণতাসহ আমাকে গ্রহণ করো, আমার নিঃস্বতার মধ্যে আমাকে
রা, আমাকে তোমার আনন্দে পরিপূর্ণ করো, তোমার অস্তিত্বে পরিপূর্ণ করো। আমি এ
মার, আমি তোমার বংশবদ। হে প্রভু পার্থিব সকল আকাংখা থেকে মুক্ত হবার প্রত
মি তোমার সান্নিধ্যে উপনীত হয়েছি। হে প্রভু আমি উপস্থিত, আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক।"

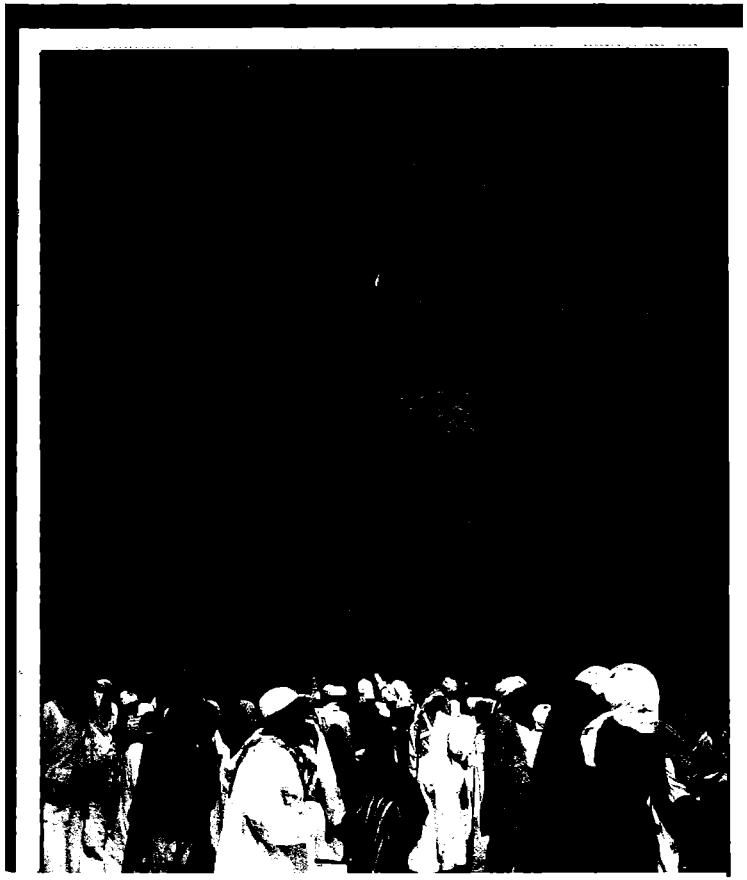

হে প্রভু আমি উপস্থি

www.pathagar.com

আমি ১৫ মার্চ থেকে ১৭ মার্চ পর্যন্ত মক্কা শরীফে ছিলাম। ১৫ মার্চ ওমরাহ সম্পন্ন লাম। কাবা ঘর তাওয়াফ এবং সাফা মারওয়া পরিভ্রমণ শেষে এশার নামাজ পড়ে াস্থানে ফিরলাম। ১৬ তারিখে মুজদালেফা, আরাফাত, মীনা এবং হিরা দেখে মধ্যরাত্রিতে ার কাবা গৃহ তাওয়াফ করলাম। যতদিন মক্কা শরীফে আসিনি ততদিন শুধু কল্পনার ্যই কাবা গৃহ পরিক্রমার কথা ভেবেছি। কিন্তু বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে কত দুস্তর যে ধান তা এখানে উপস্থিত না হলে বোঝা যায় না। এখানে উপস্থিত হওয়ার অর্থ একটি শয়মুক্ত নির্মল সময়ের মধ্যে উপস্থিত হওয়া, এখানে উপস্থিত হওয়ার অর্থ জীবনের লতা থেকে মুক্ত একটি উদার সময়ের মধ্যে উপস্থিত হওয়া। সকল কর্মের অবসানে একটি ন্তকাল পরিক্রমার মধ্যে আমরা তাওয়াফের সময় উপস্থিত হই। একজন মুসলমানের যথার্থ াস একটি উপলব্ধির স্বাক্ষরে প্রমাণিত হয় যখন সে কাবা গৃহ পরিক্রমা শেষে আল্লার কাছে ান নিবেদন উপস্থাপন করে। মানুষ এখানে এসে একটি বিশ্বাসের স্রোতোধারার মধ্যে জকে প্রাবাহিত করতে চায়, যে বিশ্বাস, প্রথম পুরুষ হযরত আদম থেকে আরম্ভ হয়েছে।

১৮ মার্চ সকালবেলা বাসে চড়ে মক্কা থেকে মদিনার পথে রওয়ানা হলাম জিয়ারতের দেশ্যে।

একদিন কাফেরদের অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে রসূলে খোদা হযরত আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে া থেকে মদিনায় গমন করেছিলেন। সেই স্মৃতিকে লক্ষ্য করে সর্বদাই মানুষ হজ্জ অথবা রাহ শেষে জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে মদিনায় যায়। একদিন কাফেররা যখন রসূলকে া করার কিংবা খুন করার অথবা তাঁকে নির্বাসন দেবার ষড়যন্ত্র করছিল আল্লাহ তখন াশল করেছিলেন এবং রসূলকে মদিনায় প্রেরণ করেছিলেন। মক্কা ত্যাগের পূর্বে রসূল রাত্রিতে ান গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আবু বকরের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি আবু রকে বললেন, *আল্লাহ আমাকে মক্কা ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন।*

আবু বকর বললেন, *তাহলে আমিও আপনার সঙ্গে যাবো।*

আবু বকরের দুটি উট প্রস্তুত ছিল। সে দুটি উটে আরোহণ করে এই দুইজন আল্লার পথের ক মদিনার পথে রওয়ানা দিলেন। পথের মধ্যে একটি গুহায় তাঁরা আশ্রয় গ্রহণ করেন। া যখন গুহায় অবস্থান গ্রহণ করছিলেন তখন কাফেরগণ পদচিহ্ন অনুসরণ করে সেই গুহার

www.pathagar.com

নিকটে উপস্থিত হয়। কাফেরদের শব্দ শুনে হযরত আবু বকর বললেন, *কাফেররা সম্ভবত আমাদের দেখে ফেলেছে। আমি তাদেরকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।*

রসূলে খোদা বললেন, *শান্ত হও, উদ্বিগ্ন হয়ো না। আমাদের সঙ্গে আল্লাহ আছেন।*

রসূলে খোদা তখন কোরান শরীফের আয়াত পাঠ করলেন *এবং স্মরণ করো যখন কাফেররা তোমাকে বন্দী করার কিংবা খুন করার কিংবা তোমাকে নির্বাসন দেবার ষড়যন্ত্র করছিল, তারা প্রতারণা করছিল এবং আল্লাহও কৌশল করেছিলেন এবং আল্লাহ শ্রেষ্ঠ কৌশলী।*

তিনদিন এবং তিনরাত তাঁরা গুহার মধ্যে কাটিয়েছিলেন। কাফেররা যখন গুহার মধ্যে আর প্রবেশ করল না এবং মক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন করল তখন রসূলে খোদা আবু বকরকে নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন। কাফেররা গুহার মুখে মাকড়শার জাল দেখেছিল আর একটি কবুতরের বাসা দেখেছিল। তাতে তাদের ধারণা হয় যে, গুহার মধ্যে কেউ প্রবেশ করেনি। গুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে তিনি শেষ বারের মতো জন্মভূমি মক্কার দিকে তাকালেন এবং বললেন, *এই পৃথিবীর সমস্ত জায়গায় চেয়ে তুমি সুন্দর মনে হলেও তোমাকে আমার ছেড়ে যেতে হচ্ছে। এখানকার মানুষ যদি আমাকে তাড়িয়ে না দিত আমি কখনোই তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।*

তিনি উটের পিঠে আরোহণ করে কোরান শরীফের একটি আয়াত পাঠ করলেন যেখানে বলা হয়েছে, *যিনি আপনার উপর কোরান অবতীর্ণ করেছেন তিনি আপনাকে পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন।*

তাঁদের পথ নির্দেশক ছিলেন ইবনে উরিকাত। ইবনে উরিকাতের তত্ত্বাবধানে রসূলে খোদা ইয়াসরীব অর্থাৎ মদিনার পথে যাত্রা করলেন। সাধারণত সবাই যে পথ দিয়ে মদিনায় যাতায়াত করত সে পথে দিয়ে তাঁরা যাননি। প্রথমে তাঁরা গিয়েছিলেন দক্ষিণ দিকে, তারপর তিহামা গোত্রের এলাকা অতিক্রম করে লোহিত সাগরের দিকে এবং অবশেষে একটি মোড় ঘুরে মদিনায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। দীর্ঘ যাত্রায় উট দু'টো কোথাও থামে নি। প্রথম দিন ও রাত তাঁরা কোথাও না থেমে তাঁরা পথ চলেছেন এবং প্রথম দিনের সূর্যাস্ত এবং পরের দিনের সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করেছেন। সীমাহীন মরুভূমির অসীম নীরবতার মধ্যে রসূলে খোদা তাঁর সুললিত কণ্ঠে কোরান শরীফ পাঠ করেছেন। কোরানের যে আয়াতটি তিনি প্রথম পাঠ করেন তার ভাবার্থ হচ্ছে, *যে নগরবাসী তোমাকে বিতাড়িত করে দিয়েছে তার চেয়ে অধিকতর শক্তিমান কতো নগরবাসীকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তখন কেউ তাদের সাহায্যকারী হয়নি। যে ব্যক্তি আপন প্রভু থেকে প্রাপ্ত স্পষ্ট দলিলের উপর নির্ভর করে আছে সে কি সেই ব্যক্তির মতো যে তার আপন কুকর্মের দ্বারা সুশোভিত এবং আপন ইচ্ছার অনুগত? নেককার মানুষের জন্য যে বেহেস্তের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার অবস্থা এমন যে, সে সেখানে বিশুদ্ধ পানির নহর পাবে এবং দুধের পানির নহর পাবে যার আস্বাদ পরিবর্তিত হয় না।*

www.pathagar.com

যাত্রার তৃতীয় দিনে উম্মে মাবাদ নামক এক মহিলার তাঁবুতে তাঁরা বিশ্রাম গ্রহণ করেন। সেখান থেকে যখন চলে যান তখন উম্মে মাবাদের স্বামী তাঁবুতে প্রত্যাবর্তন করে আশ্রিত অতিথিদের সম্পর্কে তার স্ত্রীর কাছে সংবাদ পায়। উম্মে মাবাদ তার স্বামীকে বলে, *উজ্জ্বল মুখকান্তির এই লোকটি দেখতে অত্যন্ত সুন্দর, তাঁর আচরণ সভ্য এবং ভদ্র। তাঁর মুখমন্ডল লম্বাও নয়, গোলও নয়, তাঁর চুল ঘন কৃষ্ণবর্ণ, তাঁর মেরুদন্ড সোজা এবং লম্বা। তাঁর মুখে ঘন দাঁড়ি। তিনি যখন নীরব থাকেন তখন তাঁকে গম্ভীর দেখায়। যখন কথা বলেন, তখন যেন আদেশের ভঙ্গিতেই কথা বলেন। তাঁর আচরণ এমন যে, সবাই তাঁকে মান্য করতে চায়। তাঁর কথা আবেগময় এবং মনোমুগ্ধকর। তাঁর কথা দীর্ঘও নয় এবং স্বল্পও নয়। তাঁর অপর সঙ্গীদের তুলনায় তিনি দেখতে সুন্দর এবং সম্মানের অধিকারী।*

উম্মে মাবাদের স্বামী এই বিবরণ শুনে বলল, *মক্কায় যে ব্যক্তির আবির্ভাবের কথা লোকেরা বলছে এবং যে ব্যক্তি আল্লার নবী বলে দাবী করছেন, ইনি নিশ্চয়ই সেই লোক। আমি দুঃখিত যে, তাঁর আগমনের সময় উপস্থিত ছিলাম না। উপস্থিত থাকলে আমি তাঁর সঙ্গেই যাত্রা করতাম।*

যে পথ দিয়ে রসূলে খোদা মক্কা থেকে মদিনায় গিয়েছিলেন অবিকল সেই পথ দিয়ে বর্তমান রাস্তা তৈরী হয়নি। তবে কিছু কিছু অংশ পুরনো পথ রেখাকে অনুসরণ করেছে।

মক্কা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পথিমধ্যে গার এ সোওর বা গুহায় রসূলে খোদা আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন সে গুহা এখনো আছে। তবে পথিকদের দর্শনীয় স্থানের মধ্যে তা পড়ে না এবং বাসযাত্রীরা এ গুহা দেখবার সৌভাগ্য পায় না। মক্কা থেকে মদিনা যাত্রার পথের দু'পাশে শিলীভূত পর্বতশ্রেণী। পর্বতগুলো কঠিন কৃষ্ণপ্রস্তরে আবৃত, দুপুরের রৌদ্রতাপে রুক্ষ পর্বতশ্রেণীও উজ্জ্বল দেখায়। যতই বাস মদিনার নিকটবর্তী হতে থাকে ততই বৃক্ষের শোভা লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায়, পরিপুষ্ট এবং সজীব খেজুর গাছ বিভিন্ন জায়গায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আরো কিছু কিছু গাছ চোখে পড়ে। কখনও কখনও বেদুঈনদের তাঁবু পাহাড়ের সানুদেশে খাটানো হয়েছে, কিন্তু কোথাও মানুষের গতিবিধি দৃষ্টিতে আসে না। শুধুমাত্র দীর্ঘ পথ দিয়ে আধুনিক যন্ত্রযানের দ্রুতযাত্রা দেখা যায়। এক সময় এসব পথ দিয়ে উট যাতায়াত করত। তখন উটই ছিল একমাত্র যানবাহন। মক্কা মদিনার দীর্ঘ পথে আমি কোথাও একটি উট দেখিনি। তবে জেদ্দা থেকে মক্কার পথে একটি উট চারণ ক্ষেত্র দেখেছিলাম। আধুনিক নগর নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে যাতায়াতের সুপরিচ্ছন্ন ব্যবস্থাপনায় উটের প্রয়োজন আর নেই। কিন্তু মরুভূমির ভেতরে এখনও উটই একমাত্র যানবাহন।

মদিনা শরীফের বাসস্টপে গাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সঙ্গী খান সাহেব দু'হাতে মালপত্র নিয়ে প্রায় দৌড়াতে লাগলেন। আমি এবং আলী নকী তাঁর সঙ্গে তাল রাখবার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু পারছিলাম না। খান ছুটে চলেছিলেন উচ্ছ্বসিত আনন্দে। তাঁকে ডেকেও থামাতে

www.pathagar.com

পারছিলাম না। অবশেষে মসজিদে নববীর বিপরীতে বিপণী কেন্দ্রের পিছনে একটি ক্ষুদ্র গলির মধ্যে একটি গৃহের সামনে খান এসে থামলেন। এই গৃহটি একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক মদিনার মেহমানদের জন্য ভাড়া খাটিয়ে থাকেন। তিনি ভাড়া নিয়েছেন একজন আরব ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এবং গৃহটিকে অতিথিশালায় পর্যবসিত করেছেন। এই গৃহের নিচের তলায় জানালাহীন একটি কক্ষ আমরা ভাড়া নিলাম। এখান থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে একটি পাকিস্তানী রেস্তোরায় দুপুরের আহার সেরে আমরা মসজিদে নববীর মধ্যে প্রবেশ করলাম। বর্তমানে মসজিদটির সম্প্রসারণের কাজ চলছে।

বিপুল আয়তনের এই মসজিদটি স্থাপত্য সজ্জায় অপরূপ এবং পরিচ্ছন্ন। চতুর্দিকে খিলানযুক্ত আবরিত অংশ। মাঝখানে বিপুল উন্মুক্ত চত্বর। সম্মুখভাগে প্রশান্তবিস্তৃত পরিসরের এক পাশে রসূলে খোদার রওজা মোবারক এবং অন্যত্র নামাজ পড়ার ব্যবস্থা। আমরা জোহরের নামাজ শেষ করে রওজা মোবারকের সামনে এলাম। এখানে উপস্থিত হয়ে একজন বিশ্বাসীর চিত্তে যে অনুভূতি জাগে তা পৃথিবীর কোনো ভাষার প্রকাশ করা যায় না। রওজা মোবারকের সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক মানুষ বলতে থাকেঃ আমি আল্লার প্রিয় রসূলের সম্মুখে দন্ডায়মান। আমার উপস্থিতি সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন। আমি সেই মহান নবীর দরোজায় হাজির হয়েছি যাঁর শাফায়াত আল্লার দরবারে অবশ্যই কবুল হবে। এ মহান দরবার থেকে কেউ নিরাশ হয় না, কেউ খালি হাতে ফিরে যায় না। হে আল্লাহ, তোমার প্রিয়তমের দরবার থেকে আমিও খালি হাতে ফিরে যাব না, এ বিশ্বাস আমি পোষণ করি।

সকল মানুষ যখন রওজা মোবারকের সামনে দাঁড়িয়ে রসূলকে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে তখন আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে যে কলগুঞ্জন নির্মিত হয় তা অতুলনীয়। সকলেই বলতে থাকেঃ *আসসালাতু ওয়াসসালামু ইয়া রাসুলাল্লাহ– আসসালাতু ওয়াসসালামু অ্যালাইকা ইয়া নবীউল্লাহ, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবীবুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া খাইরা খালকিল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া সাইয়িদাল মুরসালীন, আসসলাতু ওয়াসালামু আলাইকা খাতামুন নাবীঈন,আসসালামু আলাইকা ইয়া রাহমাতাল্লীল আলামীন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া শাফীয়াল মুজনাবীন।*

এই সালাম প্রদর্শনের পর নানাবিধ প্রার্থনায় আকুল কণ্ঠস্বরগুলো উচ্চকিত হতে থাকে বিস্ময়ে বিমূঢ়, আবেগে উচ্চকিত এবং পরম সৌভাগ্য অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সকলেই বলতে থাকেঃ *ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার সহায়তা এবং শাফায়াত কামনা করি এবং আপনার উপলক্ষে আল্লার দরবারে এই এই আবেদন পেশ করি যেন আপনার দ্বীন এবং আপনার আদর্শের পূর্ণ অনুসারী অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়।*

সকল অনুভূতি হয়তো শব্দে বাঙ্ময় করা যায়, কিন্তু মসজিদে নববীতে রওজা মোবারকের সামনে একজন বিশ্বাসের চিত্তে যে অনুভূতি জাগে তাকে কোনো শব্দের ব্যাখ্যায় মূর্ত করা যায় না। আমার মনে হয়েছিল যেন একটি অনন্তকাল পরিক্রমায় আমি একটি জাগরূক

www.pathagar.com

সত্তার সম্মুখে এসে উপনীত হয়েছি। আমার মনে হয়েছিল জীবনের সকল প্রকার আকাংখা থেকে নিজেকে মুক্ত করে আমি একটি আকুল আকাংখার মধ্যে আপনাকে নিঃশেষ করছি। সে আকাংখা সত্যে সমাবৃত হওয়ার, সে আকাংখা প্রেমে সঞ্জীবিত হওয়ার, সে আকাংখা নিবেদনে একান্ত হওয়ার এবং সে আকাংখা বিশ্বাসের গভীরতায় অবগাহন করার। একজন মানুষের জীবন কি করে তখন সার্থক হয়? এ প্রশ্নের উত্তর সহজে কেউ দিতে পারে না। আমার মনে হয় মানুষ যখন আল্লার কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করতে পারে তখন একটি পরিচ্ছন্নতার প্রশান্তির মধ্যে তার জাগরণ ঘটে। সেই জাগরণের মধ্যেই তার সার্থকতা।

নবম হিজরী রবিউল আউয়াল মাসে একদিন রাত্রিতে রসূলে খোদা জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে প্রার্থনা করলেন, *হে কবরের অধিবাসীবৃন্দ, তোমরা আল্লার আশিসসিক্ত হও। তোমরা শান্তিতে অবস্থান করো। বর্তমানে তোমাদের জন্য কোন শংকা নেই। অন্ধকার রাত্রির বেদনা নেই। যারা বেঁচে আছে এ বেদনা তারাই বহন করছে।*

জান্নাতুল বাকী থেকে ফিরে তিনি রাত্রির মধ্যযামে হযরত আয়েশার গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁর অসুস্থতা দেখা দেয়। এরপরে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই রসূলে খোদার দেহান্তর হয়। মৃত্যুর পূর্বে কন্যা ফাতিমাকে ডেকে তাঁর কানে কিছু বললেন। ফাতিমা ক্রন্দনে আকুল হলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন ফাতেমাকে ডেকে আবার কিছু বললেন তখন ফাতিমার মুখ হাস্যে উদ্ভাসিত হল। এই একবার কান্না পরে আবার হাসির তাৎপর্য লোকেরা জানতে চাইলে ফাতিমা বললেন, *প্রথমবার রসূলে খোদা আমাকে জানালেন যে, তাঁর মৃত্যু সন্নিকট, তখন আমি আমার কান্না থামাতে পারিনি। দ্বিতীয়বার তিনি আমাকে জানালেন যে, তাঁর পরিজনবর্গের মধ্যে আমি সর্বপ্রথম তাঁর সঙ্গে যোগ দেব। তখন আমি আনন্দে হেসেছিলাম।*

সোমবার ১২ই রবিউল আউয়াল হযরত আবু বকর যখন নামাজ পড়াচ্ছিলেন তখন হযরত আয়েশার কক্ষের দরোজা খুলে গেল এবং রসূলে খোদা আলী এবং আল-ফজল এ দুজনের সাহায্যে ধীরে ধীরে মসজিদে এলেন এবং আবু বকরকে নামাজের ইমামতি করতে নির্দেশ দিলেন। এটাই রসূলের শেষ জামাত।

গৃহে প্রত্যাবর্তন করে আয়েশার ক্রোড়ে শায়িত অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গৃহের রমণীকুল তখন সমস্বরে ক্রন্দন করতে থাকে। ক্রন্দনের শব্দ শুনে মুসলমানগণ মসজিদে সমবেত হয়। তারা কেউ বিশ্বাস করতে পারেনি যে, রসূলে খোদার মৃত্যু হয়েছে। তারা বলতে থাকে, *কি করে তাঁর মৃত্যু হতে পারে? আমরা কি বিশ্বাস করি না যে শেষ বিচারের দিন তিনি আমাদের অবস্থার সাক্ষী হবেন? তিনি মরেন নি। তিনি হযরত ঈশার মতো বেহেশতে গমন করেছেন।* হযরত উমর তখন বললেন, *তাঁর মৃত্যু নেই-তাঁর মৃত্যু হতে পারে না। তিনি আল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছেন। সাক্ষাতের পর আমাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবেন। হযরত মূসা আল্লার কাছে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন, ৪০ দিন পর তাঁর জনগোষ্ঠীর মধ্যে আবার প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তেমনি আমাদের রসূলও প্রত্যাবর্তন করবেন।*

www.pathagar.com

হযরত আবু বকর হযরত উমরকে এবং উপস্থিত বিশ্বাসিগণকে শান্ত করে বললেন, *হে বিশ্বাসিগণ, যদি তোমরা মুহাম্মদের প্রতি বিশ্বাস এনে থাকো এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য এনে থাকো, তাহলে জেনে রাখো যে মুহাম্মদের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাকো তাহলে জেনে রাখো যে, আল্লাহ চিরকাল বেঁচে আছেন, তাঁর মৃত্যু নেই। তোমাদের কি কোরান শরীফের সেই আয়াতের কথা স্মরণ নেই যেখানে আল্লাহতায়ালা বলছেন, "মুহাম্মদ একজন আল্লার পয়গম্বর। তাঁর পূর্বে যত পয়গম্বর এসেছেন সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন, যদি মুহাম্মদের মৃত্যু হয় অথবা তিনি নিহত হন তখন কি তোমরা পলায়ন করবে? হে মুহাম্মদ, তুমি যথার্থ মরণশীল এবং তোমার পূর্ববর্তী সকলেই মরণশীল ছিলেন।*

এরপর আয়েশার গৃহের যে স্থানে তিনি শয়ন করতেন ঠিক সেই স্থানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। বর্তমানে মসজিদে নববীর মধ্যে এক প্রান্তে এই রওজা মোবারক স্থাপিত। রওজা মোবারক সম্পূর্ণভাবে আবরিত। ভেতরে প্রবেশ করবার অধিকার কারোর নেই। রওজার দেয়ালও কেউ স্পর্শ করতে পারে না। দূরে দাঁড়িয়ে ফাতেহা পাঠ করতে হয়। রওজা মোবারক পার হয়ে বাঁ দিকে মোড় ঘুরে ডান দিকে বাবে জিব্রিল। এ দরোজা দিয়ে হযরত জিব্রাইল রসূলের কাছে আল্লার বার্তা নিয়ে আসতেন।

আমরা ১৮ এবং ১৯ মার্চ মদিনা শরীফে ছিলাম। ২০ মার্চ দ্বিতীয়বার ওমরাহ্ করার উদ্দেশ্যে মক্কা প্রত্যাবর্তন করলাম।

www.pathagar.com

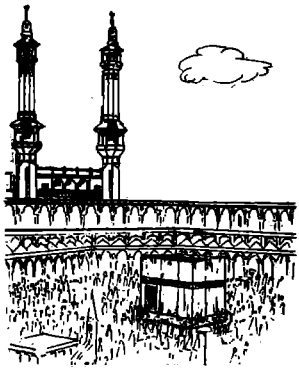

মক্কা থেকে মদিনার পথে একটি তীব্র অনুভূতিতে সমগ্র দেহ-মন পরিপ্লাবিত ছিল। তাই তখন বাসের মধ্যে কে কি আচরণ করছে তা দেখবার এবং তা নিয়ে ভাববার সময় পাইনি। কিন্তু এবার মদিনা থেকে মক্কার ফেরার পথে কিছু লক্ষ্যযোগ্য ব্যাপার আমার বিবেচনায় ঘটেছিল, সে কথা একটু বলব। ২০ তারিখে জুমার নামাজ মসজিদে নববীতে আদায় করে বাসে উঠেছিলাম-আমি, আলী নকী এবং ইঞ্জিনিয়ার খান। খান এবং আলী নকী এক পাশের দুটি সীটে বসেছিল, অন্য পাশের সীটে জানালার দিকে আমি ছিলাম এবং আমার পাশে ছিল এক পাকিস্তানী ভদ্রলোক। আমরা সবাই ওমরাহর কাপড় পরে ছিলাম। মক্কা শরীফ ওমরাহ করে মদিনায় যাওয়ার পর আবার মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে দ্বিতীয়বার ওমরাহ করতে হয়। যারা জেদ্দায় চলে যান তাদের কথা আলাদা। দুটোয় বাস ছাড়ার কথা, ছাড়ল আড়াইটায়। আমার পাশের ভদ্রলোক আমার পরিচয় নিতে ব্যগ্র হয়ে পড়লেন। মনে হল ভদ্রলোক কথা না বলে চুপ করে থাকতে পারেন না। নানাবিধ জিজ্ঞাসাবাদের পর যখন জানলেন যে আমি বাংলাদেশী তখন হঠাৎ আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন," পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের অবস্থা ভালোই তো ছিল, না?"

আমি হঠাৎ এ প্রশ্নে চমকে উঠলাম। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম যে আশেপাশের কয়েকজন পাকিস্তানী আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে। কোনোরূপ বিবাদের আশংকা না ঘটে সেজন্য আমি সংক্ষেপে বললাম,"হাঁ, ভালোই ছিল।"

ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করলেন, "স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশ এখন কেমন আছে?"

আমি উত্তরে বললাম, "ভালোই আছে।"

লোকটি আবার প্রশ্ন করল, "বাংলাদেশ কি হওয়ার দরকার ছিল?" আমি এবারে উত্তর করলাম, "নিশ্চয়ই, আগে একটি মুসলমান দেশ ছিল, এখন দুটি মুসলমান দেশ হয়েছে।"

লোকটি তখন চুপ করল। কিন্তু কথা বলা যাদের অভ্যাস তারা থামতে পারে না। লোকটি কিছুক্ষণ পর জানালার বাইরে দৃষ্টিপাত করে কালো পাহাড়গুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, "দেখা? সব লোহা হ্যায়।"

আমি ভাবলাম লোকটি পাহাড়ের কালো পাথরগুলো যে লোহার মতো দেখাচ্ছে তাই বোঝাতে চাচ্ছেন। আমি সায় দিলাম, "হাঁ, লোহার মতোই মনে হচ্ছে বটে।"

www.pathagar.com

কিন্তু আমার কথায় লোকটি যা বলল তাতে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। লোকটি বলল, "আপনি মনে হচ্ছে বলছেন, এগুলো তো সত্যি লোহা।"

আমি তখন বুঝলাম এর ধারণা যে, পাহাড়গুলো লোহার তৈরী। সুতরাং এর সঙ্গে কোনোরূপ সংলাপে অংশ নিয়ে লাভ নেই ভেবে আমি হেসে চুপ করে রইলাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলো, হঠাৎ লোকটি চিৎকার করে উঠলো, "উয়ো, দেখো দেখো, মারিজোনা খাতা হ্যায়।"

ঘটনাটা হয়েছে কি খানের খৈনি খাওয়ার অভ্যাস। সে তামাক পাতার মধ্যে চুনা লাগিয়ে হাতের তালুতে ডলে ছোট ছোট গুলি বানিয়ে দাঁতের গোড়ায় দিচ্ছিল। এটা দেখেই লোকটি চিৎকার করেছে। খান লোকটার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, "ইয়ে তাম্বাকু হ্যায়।"

লোকটি তবু বলল, "এ্যায়সো করে তাম্বাকু খানাভি ঠিক নেহী।"

খান তখন ক্রুদ্ধ স্বরে লোকটিকে বলল, "আমি তাম্বাকু খাই আর যাই খাই তাতে আপনার কি?" ক্রমশ স্বর উচ্চগ্রামে উঠছিল। গোলোযোগের শব্দ শুনে বাসের কন্ডাকটার এগিয়ে এসে কয়েকবার 'খালাস খালাস' বলে সবাইকে থামিয়ে দিল। আলী নকী 'শুকরান লাক' বলে লোকটিকে ধন্যবাদ দিল।

এই ঘটনা আমি একটু বিস্তারিত বললাম এই কারণে যে, মক্কা মদিনায় সাধারণ বাঙালীরা পাকিস্তানীদের কাছে হেয় বলে প্রতিপন্ন। পাকিস্তানীদের সংখ্যাও এ দুটি শহরে অনেক বেশি। পাকিস্তানীদের ক্ষোভের একটি অর্থনৈতিক কারণ আছে। মক্কা মদিনায় কিছু কিছু চাকরি, যেগুলো এককভাবে পাকিস্তানীরাই করত সেখানে বাঙালীরাও এসে উপস্থিত হয়েছে। তার ফলে ছোটখাটো ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য গড়ে উঠেছে। তাছাড়া বাংলাদেশ সৃষ্টির ফলে পাকিস্তানীদের কিছু ক্ষোভ থাকতেও তো পারে। যতদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন চলছিল ততদিন এদেশে পাকিস্তানী প্রচার মাধ্যমগুলো বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটি মনোভঙ্গি গড়ে দিয়েছিল যার ফলে বাংলাদেশ হওয়ার পরও বহুদিন পর্যন্ত সৌদিরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। স্বীকৃতি দেওয়ার পরও ভ্রান্ত ধারণা এখনো অপনোদিত হয়নি।

আমার মনে আছে ১৯৭৮ সালে মক্কা শরীফের একজন ইমাম ঢাকায় এসেছিলেন। বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর নানারকম সংশয় ছিল। তিনি এক পর্যায়ে এখানে এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, বাংলাদেশে মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের সমান না কম। এই ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্যাদি কিছু পাকিস্তানী লোকেরা আরবদেশে ছড়িয়েছিল। তাছাড়া আর একটি বিষয়ও আছে। বহু বাংলাদেশী কর্ম সংস্থাপনের আশায় বিভিন্ন দালালের খপ্পরে পড়ে এ দেশে এসে জেলে যায় বা হাজতবাস করে। এসব লোকেরা বাংলাদেশ সম্পর্কে যে পরিচয় নির্মাণ করে তা মোটেই সম্মানজনক নয়। অনেক বাঙালী আবার জাকাতের জন্য হাত বাড়ায়, যার ফলে তার স্থানীয় মানুষের কাছে কোনো সম্মান পায় না।

www.pathagar.com

মদিনা শরীফে একটি ছোট পাকিস্তানী হোটেলে আমরা একদিন খেতে বসেছিলাম। যে ঘরে আমি বসেছিলাম তার বাইরে একটি খোলা জায়গায় আরো কিছু লোক খেতে বসেছিল। এরা সবাই সিলেটি ভাষায় তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা আলোচনা করছিল। এদের মধ্যে একটি লোক অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলছিল, "আমাকে তো আপনারাই ব্যবস্থা করে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু এখানে এসে দেখি সব ভুয়া। শেষ পর্যন্ত আমি পুলিশের তাড়া খেয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকি। কিছুদিন বন্ধুদের সঙ্গে মরুভূমিতে ছিলাম।" আরো অনেক কথার মধ্যে আমি এই কথাগুলো ধরতে পেরেছিলাম। যাই হোক আমাদের খাওয়া শেষ হতে আমরা ঘরে থেকে বেরুলাম। কিন্তু খান এক কান্ড করে বসল। সে হঠাৎ ওদের টেবিলের কাছে এসে বলল, "জোরে জোরে কথা বলে বিপদ টেনে আনবেন না, এখানকার পুলিশরা বাংলাও তো জানতে পারে।" খান-এর কথা শেষ না হতেই লোকটি চেয়ার ফেলে দিয়ে একটি পানির গ্লাস উল্টিয়ে দৌড়িয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল। যারা তার সঙ্গে কথা বলছিল তারা কোনোরূপ বাধা দেওয়ার সুযোগই পেল না। আমরা তাড়াতাড়ি ওখান থেকে চলে এলাম।

কিছু কিছু বাংলাদেশী এখানে এসে ব্যবসা করবার চেষ্টা করছে। স্বনামে ব্যবসা করা অসম্ভব, সুতরাং সৌদী পার্টনার নিয়ে ব্যবসা করতে হয়। এরকম কয়েকজন বাংলাদেশীকে আমি মদিনা শরীফে দেখেছি। চট্টগ্রাম এজেন্সি নামে একটি ছোটখাটো দোকান মসজিদে নববীর বিপরীত রাস্তায় দেখেছি। দোকানে যে ভদ্রলোক ছিলেন তার সঙ্গে কথা বলে জানলাম যে, দোকানের মালিকানা স্বত্ব একজন সৌদীর নামে। বাঙালী ভদ্রলোকই সবকিছু করে, মাসের শেষে লভ্যাংশের অর্ধেক সৌদী লোকটির বাড়িতে পৌছে দিয়ে আসে। মসজিদে নববীতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে যারা নিযুক্ত আছে তাদের মধ্যে আমি দু'তিনজন নোয়াখালী এবং কুমিল্লার লোক পেয়েছিলাম।

যাঁরা হজে গিয়েছেন তাঁদের কারো কারো মুখে আমি মদিনার পথে একটি রেষ্টুরেন্টের মাছ ভাজার কথা শুনেছিলাম। আমাদের বাস যখন মক্কার পথে বিশ্রামের জন্য একটি রেষ্টুরেন্টে থামল তখন আমরা ভাত এবং মাছ ভাজার অর্ডার দিলাম। অর্ডার নেওয়ার সময় জিজ্ঞেস করল যে, আমরা কবীর না সগীর চাই অর্থাৎ বড় মাছ চাই না ছোট মাছ চাই। কিন্তু খাবার টেবিলে মাছ দেখেই আমাদের চোখ বড় হয়ে গেল। আমরা ছোট মাছের অর্ডার দিয়েছিলাম। ছোট, কিন্তু আসলে ছোট নয়। একটি ১৭/১৮" মতো লম্বা, পুরো মাছটি কোনোরূপ মশলা ছাড়া শুধু তেলের মধ্যে ভেজে এনেছে। লবণ ছিটিয়ে খাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ভেতরটা সম্পূর্ণ কাঁচা থাকায় খেতে পারলাম না। খান কিন্তু খেয়ে নিলেন। তাঁর বক্তব্য, পয়সা দিয়ে কেনা হয়েছে সুতরাং খেতেই হবে।

এদেশে মানুষের খাদ্য-স্বভাবে কোনো বিলাসিতা নেই। অতীত কাল থেকেই এসব অঞ্চলের মানুষ ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই আহার্য গ্রহণ করেছে, স্বাদের জন্য নয়। রসূলে খোদা নিজে

www.pathagar.com

পরিমিত আহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, কখনও তিনি বিলাসবহুল খাদ্য খেয়েছেন এমন ঘটনা কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। তিনি ফল খেতেন, মধু খেতেন, রুটি খেতেন। তিনি স্বল্পাহারী ছিলেন, যা কিছু খেতেন একটি পরিচ্ছন্নতার আবহে খেতেন। আমি এদেশে ময়দার তন্দুরী নানরুটি খেয়েছি। অপূর্ব সুস্বাদু বিরাট আকারের গোলাকৃতি রুটি, একটি রুটি চারজনে খেতে পারে। ময়দার মধ্যে কিছু জিরার গুড়ো এবং কিছু আদার গুড়ো আর লবণ দেওয়া হয় যার ফলে একটি বিশিষ্ট ধরনের স্বাদ আসে। তবে এখন আধুনিক সময়ে আধুনিক প্রকরণে জীবনের যে নতুন পরিচয় নির্মিত হচ্ছে সেখানে পৃথিবীর সকল দেশের খাবারই আরব ভূখন্ডে পাওয়া যাচ্ছে, বিশেষ করে বড় বড় শহরে। বড় বড় হোটেল এবং বিভিন্ন দেশীয় রেস্তোরাঁ সকল বড় শহরেই আছে। তার ফলে খাদ্য ব্যবস্থায় প্রাচীন রীতিপ্রকরণগুলো এখন আর তেমন বিদ্যমান নেই। অবশ্য বেদুঈনরা–যাদেরকে নগরীর শৃংখলার মধ্যে কোনোক্রমেই বাঁধা যায়নি, তারা এখনো আদিম স্বভাবের জীবন যাপন করে। তারা এখনো ছোট ছোট বন্য জন্তু শিকার করে খায়। এগুলোর মধ্যে খরগোশ আছে এবং গোসাপের মতো এক ধরনের চতুষ্পদ জন্তু আছে, যেগুলো বালুর ভেতর গর্ত করে থাকে। সৌদী প্রশাসন বহুদিন ধরে চেষ্টা করে আসছে এদেরকে নগরমুখী করতে। কিন্তু পারেনি। জেদ্দা থেকে মক্কার পথে, পথের একদিকে একটি বাসগৃহ প্রকল্প লক্ষ্য করেছিলাম। সেগুলো যাযাবর বেদুঈনদের জন্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তারা এই শৃংখলার জীবন মেনে নিতে পারেনি। তারা আবার মরুভূমিতে চলে গিয়েছে। দীর্ঘকালের উন্মুক্ত জীবনের একটি বিশ্বাস এবং বরাভয় আছে, যা ফেলে কেউ সভ্যতার বন্ধনে আসতে চায় না। বেদুঈনরাও তাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করছে। তাই তারা নিয়মিত জীবনধারাকে মান্য করতে পারছে না। যাদের চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন হয় তারা কি কখনো একটি গৃহের বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে। তবে এদেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এরা এক সময় অসম্ভব হিংস্র এবং নিষ্ঠুর ছিল। অজানা পথচারীকে হত্যা করে তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করতো। আজ সর্বত্র নিয়ম এবং শাসনের প্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে বেদুঈনরা তাদের দস্যু জীবন পরিবর্তন করেছে। কিন্তু দ্বিধামুক্ত ভ্রমণ এবং যাযাবরবৃত্তি পরিবর্তন করেনি। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের মুক্ত বিচরণের ক্ষেত্রগুলো যখন সংকুচিত হয়ে আসবে তখন এরা পুরোপুরি সভ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত হবে। এদের জীবনে মাশরেক, মাগরেব, শিমাল বা জুনুব বলে কোনো দিক নেই, সকল দিকেই এরা বিচরণ করে এবং দূরে ও কাছের সব জায়গাতেই এদের পদচারণা। এদের কাছে বুকরা বা আগামীকাল বলে কোনো জিনিস নেই, এদের সবকিছুই বর্তমানকে নিয়ে অর্থাৎ এরা একটি সময়কেই চেনে যেটি হচ্ছে বর্তমান সময় –এরা তাৎক্ষণিকভাবে সমস্ত কিছু পেতে চায়। তাই দীর্ঘপথ উট ছুটিয়ে চলে, বিশ্রামকে প্রায়ই তারা অস্বীকার করে। এই জীবনের যে মাদকতা এরা লাভ করেছে, সেই মাদকতা এরা কখনও অস্বীকার করতে পারে না। মরুভূমির একটি আহ্বান আছে, যে আহ্বানে সাড়া দিয়ে এককালে বহু মানুষ গৃহহারা হয়েছিল। এখনও বেদুঈনরা সেই আহ্বান মান্য করে চলেছে। মরুভূমির এই

www.pathagar.com

যাত্রাপথে উট তাদের নিত্যসঙ্গী। বেদুঈনদের সৌজন্য তাদের উটকে নিয়ে। এখানকার একজন আমাকে বলেছিলেন যে, উট এদের ভাষা বোঝে এবং এরাও উটের ভাষা বোঝে। একটি প্রাণী এবং একজন মানুষ একটি সুনিশ্চয় মমতার বন্ধনে আবদ্ধ।

রসূলে খোদা একটি উষ্ট্রীর পিঠে চড়ে মদিনায় প্রবেশ করেছিলেন। কুবা থেকে ইয়াসরিব বা মদিনায় তিনি প্রবেশ করেছিলেন বিজয়ীর বেশে। পথের দু'পাশে কিশোর কিশোরীদল অপূর্ব উজ্জ্বল বেশে সজ্জিত হয়ে রসূলকে স্বাগত জানাল। তাঁরা দাঁড়িয়েছিল গৃহের অলিন্দে, দরজায় এবং পাহাড়ের সানুদেশে। সেদিন সমস্বরে স্বাগত সঙ্গীত হয়েছিলঃ *পূর্ণচন্দ্র জেগেছে আকাশে। সান্নিয়াতুল বিদা অতিক্রম করে পূর্ণচন্দ্র আমাদের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত। অজস্র প্রশংসা মহান আল্লার প্রতি, আমরা আমাদের পবিত্রতম অর্ঘ্য তাঁর প্রতি নিবেদন করছি। হে আল্লার প্রেরিত পুরুষ মোহাম্মদ, আপনি আমাদের যা আদেশ করবেন তা আমরা পবিত্রতম শুদ্ধিতে পালন করব।*

মদিনার অভ্যন্তরে যে সমস্ত এলাকা দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন সে সমস্ত এলাকার গোত্র প্রধানগণ রসূলের উষ্ট্রী রজ্জু ধরে রসলের যাত্রা বিরতি কামনা করছিলেন এবং বলছিলেন, *হে প্রেরিত পুরুষ আমাদের মধ্যে অবস্থান করুন। আপনি এখানে ঐশ্বর্য পাবেন, শক্তি পাবেন এবং নিরাপদ আশ্রয় পাবেন।*

সকলকেই রসূলে খোদা একই উত্তর দিচ্ছিলেন, *আমার উষ্ট্রী যেখানে গিয়ে নিজের ইচ্ছায় থামবে সেখানেই আমি অবস্থান করব।*

তিনি দয়ার্দ্র চিত্তে হাস্যমুখে সকলের কল্যাণ কামনা করছিলেন, বলছিলেন, *আল্লার আশীর্বাদ আপনাদের উপর বর্ষিত হোক।*

রসূলে খোদা তাঁর উষ্ট্রীর লাগাম ঢিলে করে দিয়েছিলেন এবং উষ্ট্রী নিজের ইচ্ছায় চলছিল। সে তার ঘাড় এদিক ওদিক ঘুরিয়ে স্থান নির্বাচনের চেষ্টা করছিল। অবশেষে একটি খোলা জায়গায় উষ্ট্রী হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়ল। কিন্তু রসূলে খোদা উষ্ট্রীর পিঠ থেকে নামলেন না। তখন উষ্ট্রী আবার উঠে দাঁড়িয়ে কিছুটা এগিয়ে গেল। পরক্ষণেই পূর্বের জায়গায় প্রত্যাবর্তন করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল এবং সম্পূর্ণ গলা মাটির সঙ্গে লাগাল। রসূল তখন উষ্ট্রীর পিঠ থেকে নামলেন এবংবললেনঃ *আল্লার নির্দেশে এখানেই আমার বসতি হবে।*

রসূলের জীবনে এই ঘটনায় উটের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের পবিত্রতম নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়।

মক্কা শরীফে পৌঁছলাম রাত ন'টায়। পথে কয়েক জায়গায় বাস থেমেছিল। এক জায়গায় ওমরাহর নিয়ত করবার জন্য, এক জায়গায় খাবারের জন্য, এক জায়গায় আছরের নামাজ এবং আরেক জায়গায় মাগরেবের নামাজের জন্য। তাছাড়া বাস চলছিল খুব আস্তে। সুতরাং দেরি হওয়াটা স্বাভাবিক। সেদিন ২০ মার্চ। বাসায় ফিরে খান আমাদের রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে লেগে গেলেন। ফ্রিজের মধ্যে মুরগী ছিল। ভাত, ডাল এবং মুরগী এসব খেয়ে ওমরাহ-র

www.pathagar.com

জন্য প্রস্তুত হতে রাত ১২টা বাজলো। রাত ১২টার সময় শেষ ওমরাহ পালনের জন্য হারাম শরীফে প্রবেশ করলাম। বিদ্যুতের আলোয় প্লাবিত হারাম শরীফের বিশাল চত্বরে তখনও অগণিত লোক। আমরা কাবা গৃহ পরিক্রমণ আরম্ভ করলাম। পরিক্রমণের সময় বারবার বলতে লাগলাম, *হে আল্লাহ তুমি আমাকে হারাম থেকে রক্ষা করো এবং হালাল বস্তু দান করো। তুমি আমাকে একমাত্র তোমার মুখাপেক্ষী করো। আমি যেন অন্যের মুখাপেক্ষী না থাকি। হে আল্লাহ তোমার এ গৃহ অত্যন্ত পবিত্র এবং তোমার অনুগ্রহ অপরিসীম। তুমি অত্যন্ত ধৈর্যশীল পুণ্যবন্ত এবং দয়ালু। তুমি ক্ষমাশীল। আমাকে তুমি ক্ষমা করো।*

সপ্তম পরিক্রমণের শেষে হিজরে আসওয়াদ চুম্বন করবার সুযোগ হয়েছিল।

মকামে ইব্রাহীমের কাছে এসে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে জমজমের পানি পান করলাম। তারপর সাফা মারওয়া সায়ী করলাম। আমার শরীর দুর্বল ছিল বলে আমি চেয়ারে বসে সায়ী করলাম। এখানে দুর্বল এবং অসুস্থ লোকদের জন্য চেয়ারে বসিয়ে সায়ী করানোর রীতি আছে। যে লোকটি আমার চেয়ার ঠেলে সায়ী করাল সে লোকটিও দোয়া-দরুদ জানে এবং বিভিন্ন সময় প্রয়োজনীয় দোয়া পড়েছিল। ওমরাহ শেষ হলো রাত দুটোয়। তখন চুল কামাতে হবে। চুল অবশ্য তিন-চার দিনে খুব বড় হয়নি। তবু নিয়ম পালন করতে হবে। অত রাত্রে কোথাও নাপিত পেলাম না। খান বলল যে, ঘরে গিয়ে সেই মাথা কামিয়ে দেবে। সে ব্যবস্থাই ঠিক রইল। বাসায় ফিরে মাথা কামিয়ে গোসল করে শুয়ে পড়লাম। রাতে স্বপ্ন দেখলাম, একটি গোলাপের বাগানের মধ্য দিয়ে হাঁটছি এবং অজস্র ফুলের সম্মিলিত সুঘ্রাণে আচ্ছন্ন হচ্ছি। এভাবে পরম আচ্ছন্নতায় অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটালাম।

পরের দিন ২১ মার্চ মক্কা শরীফে আমাদের শেষ দিন। শহরটি ঘুরে দেখলাম। কিছু জিনিস কিনলাম। বিকেল বেলা জান্নাতুল মাল জেয়ারত করতে গেলাম। জান্নাতুল মালে হযরত খাদিজাতুল কুবরার মাজার রয়েছে। এর ভেতরে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। আমরা দেয়ালের বাইরে দাঁড়িয়ে মোনাজাত করলাম। মদিনা শরীফে মসজিদে নববীর অত্যন্ত নিকটে জান্নাতুল বাকী রয়েছে। সেখানে আছে রসূলে খোদার দুধ-মা হালিমার কবর, বিবি আয়েশার কবর এবং অন্যান্য বিবিদের কবর। হযরত ওসমানের কবরটিও জান্নাতুল বাকীতে অবস্থিত। জান্নাতুল বাকী এক সময় বন্ধ ছিল। কিন্তু এখন খুলে দিয়েছে। আমরা জান্নাতুল বাকীর কয়েক জায়গায় ফাতেহা পড়েছি এবং ঘুরে ঘুরে দেখেছি। রসূলে খোদা শবে বরাতের রাত্রিতে এবং আরো বিভিন্ন সময় জান্নাতুল বাকীতে আল্লার এবাদতে মশগুল থাকতেন।

মাগরেব এবং এশার নামাজ হারাম শরীফে পড়লাম। বাসায় ফিরে রাত্রির আহার সমাধা করলাম। এখানকার কিছু বাঙালী ছাত্র রাত্রি বেলা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। এদের মধ্যে এক ভদ্রলোক আমাদের খাবারের জন্য উটের গোশত রান্না করে এনেছিল। গরুর গোশত থেকে কোনো পার্থক্য বুঝলাম না। অন্য এক ভদ্রলোক কিছু ফল নিয়ে এসেছিল।

www.pathagar.com

ফলের মধ্যে আম ছিল, আপেল ছিল, কুল ছিল। এসব ফল আসে পাকিস্তান এবং ভারত থেকে। আমরা সবাই মিলে এক সঙ্গে খেলাম।

পরের দিন ২২ মার্চ কাবা গৃহে শেষ তাওয়াফ করার জন্য গেলাম। শেষ তাওয়াফের প্রয়োজন এভাবে সবাই ব্যক্ত করেন যে, মক্কা শরীফ থেকে বিদায়ের পূর্বে আল্লাহতায়ালার কাছ থেকে শেষ বিদায় নেওয়া সকলেরই কর্তব্য। মূলত মক্কা শরীফে ওমরাহ বা হজ্জ সম্পন্ন করে মদিনা শরীফ জিয়ারত করে আবার মক্কা শরীফে প্রত্যাবর্তন করা রসূলের সুন্নতকে অনুসরণ করা। তিনি মক্কা শরীফ থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন এবং বিদায় হজ্জের জন্য আবার মক্কা শরীফে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। শেষ তাওয়াফ করবার সময় আমি এবং আলী নকী আমরা উভয়েই আবেগ আপ্লুত ছিলাম। চোখের পানি বাঁধা মানছিল না। বারবার বলছিলাম,"হে আমার প্রভু তোমার কৃপায় পৃথিবীর পবিত্রতম স্থানে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। এই সৌভাগ্যের বরাভয় দ্বারা তুমি আমার জীবনকে সমাচ্ছন্ন করো। হে আমার প্রভু, তুমি তো সর্বত্রই আছো। কিন্তু এই একটি স্থানে আমি সর্ববন্ধন এবং আকর্ষণমুক্ত হয়ে তোমার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছি। এই অনুভূতিকে আমার জীবনে সার্থক করো। মানুষ হিসাবে আমার কর্তব্য তোমার নির্দেশ পালন করা এবং তোমারই আজ্ঞায় পরিশুদ্ধ জীবন যাপন করা। পৃথিবীর মালিন্য আমাদের সকলকেই স্পর্শ করে। কিন্তু তোমার কৃপা ও সহানুভূতিতে আমরা পরিচ্ছন্ন হবার সুযোগ পাই। মানুষের পার্থিব আকাংখার অন্ত নেই। কিন্তু পার্থিব আকাংখার শেষ পৃথিবীতেই। আমি তোমার উজ্জ্বল দীপ্তির দ্বারা সমাচ্ছন্ন হতে চাই। সকল অপরাধ থেকে আমাকে মুক্ত করে হে, প্রভু, তোমার আনন্দে আমাকে আনন্দিত করো। একটি পরিচ্ছন্নতা এবং একটি পরিশুদ্ধতার মধ্যে আমাকে জাগ্রত করো। হে আমার প্রভু, আমি তোমার নিকট উপস্থিত।"

মক্কা শরীফ ছেড়ে যাওয়ার প্রাক্কালে খান সরলভাবে বলছিল," এবার কিন্তু হজ্ব আপনার জন্য ফরয হল।" আমি উত্তরে বলেছিলাম, "সবই তো আল্লার ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা ছিল বলেই আমি এবার আসতে পেরেছি। তাঁর কৃপা এবং ইচ্ছা থাকলে আমি নিশ্চয়ই হজ্বের সৌভাগ্য লাভ করব।"

ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর আরব জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গিয়েছে এবং সে সমস্ত স্থানকে কুসংস্কারমুক্ত করেছে। সূচনালগ্নের সেই সৌভাগ্যের কথা আমরা যদি স্মরণ করি তাহলে আমরা দেখতে পাই কিভাবে সেই যুগের মানুষ সমুদ্র পার হয়েছে, পাহাড় অতিক্রম করেছে এবং দুর্গম অপরিচিত স্থানে নতুন বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে তারা তুখারিস্তানে পূর্ণ প্রতাপ নিয়ে ইসলামের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তুখারিস্তান ছিল তখন বৌদ্ধদের সাধনকেন্দ্র। অজস্র বৌদ্ধ মন্দিরে গৌতম বুদ্ধের মূর্তি স্থাপিত ছিল। সেখানকার মানুষ তাদের নির্জন প্রকোষ্ঠ এবং প্রতিমার বন্ধন ছেড়ে ইসলাম কর্তৃক প্রচারিত সত্যকে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু প্রতাপী আরবগণ অধিকৃত অঞ্চলের সংস্কৃতিকে বিলুপ্ত করেনি। সে সময় আরবরা যে সমস্ত অঞ্চলে গিয়েছিল সে সমস্ত এলাকার সংস্কৃতি সংরক্ষিত হয়েছিল। তাই আজ

www.pathagar.com

আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আরব সংস্কৃতিকে পাই না। কিন্তু আপন আপন স্বদেশের সংস্কৃতির মধ্যে ইসলামের বিকাশ লক্ষ্য করি। উম্মাহ শব্দটার বিশেষ অর্থ হচ্ছে, একই বিশ্বাসে বলীয়ান এবং সমৃদ্ধ বিশ্ব মানবগোষ্ঠী। এখানে দেশ কাল এবং ভৌগোলিক প্রত্যয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায় না। এখানে দেশ কাল অতিক্রান্ত একটি প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটে।

মক্কা শরীফে এসে হারাম শরীফের অভ্যন্তরে এবং মসজিদে নববীর ভেতরে আমি বিশ্ব মানবতার একীকরণের নির্দশন দেখেছি। কত দেশের মানুষ যে এখানে আসে তার ইয়ত্তা নেই! বিভিন্ন স্বভাবের মানুষ এবং বিভিন্ন ইতিহাসের মানুষ একই ইচ্ছায় এখানে মিলিত হয়। সেই ইচ্ছা হচ্ছে আল্লার কাছে নিজেকে সমর্পণ করা, আল্লার গুণে গুণান্বিত হওয়া এবং বিশুদ্ধতা আর পরিচ্ছন্নতার জন্য আল্লার সাহায্য কামনা করা।

পৃথিবীতে বিস্ময় আছে অনেক কিন্তু পরম বিস্ময় এটাই যে, বহু যুগ অতিক্রান্ত হলেও একই প্রকৃতির আচার নিষ্ঠার মধ্যে বিশ্বের অগণিত মানুষ একত্র হচ্ছে এবং সম্মিলিত কণ্ঠে বলছে, "আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক"–হে প্রভু আমি উপস্থিত।

মানুষের জ্ঞান অর্জিত এবং অসম্পূর্ণ কিন্তু আল্লার জ্ঞান মৌলিক, সম্পূর্ণ ও চিরন্তন। সৃষ্টি সম্পর্কিত মানুষের জ্ঞান সৃষ্টির অস্তিত্বের পর অর্জিত হয়। কিন্তু এ সম্পর্কিত আল্লার জ্ঞান পূর্ব ও আদি। ভূত ও ভবিষ্যৎ, অতীত ও বর্তমান এবং আগামীকাল সবকিছুই আল্লার কাছ থেকে জাগ্রত হয়েছে। তিনি তো অন্তর্যামী। মানুষের জ্ঞান কখনোই নির্ভুল নয়। মানুষ,ঘটনা এবং সৃষ্টি অনুষ্ঠানের অংশমাত্র কিন্তু তার অধিকারী নয়। ভবিষ্যত কি হবে সে কিছুই জানে না। সেই কারণে অসম্পূর্ণ মানুষ পূর্ণ প্রজ্ঞার কাছে আত্মসমর্পণ করে। হজ্জ এবং ওমরাহ এই আত্মসমর্পণেরই নিদর্শনসমূহ।

আমি কোন্ ইচ্ছার বশংবদ তা আমি জানি না। তবে আমি জানি যে, আমি যদি আমার সকল বিশ্বাস মহান আল্লার কাছে ন্যস্ত করতে পারি তাহলেই আমার মুক্তি আসবে। 'হে প্রভু আমি উপস্থিত' এই বাক্যের মধ্য দিয়ে আমরা সকল সাংসারিক বন্ধন ছিন্ন করি এবং আল্লার কাছে পূর্ণ নিবেদনের প্রত্যয়ে কাবা গৃহে পরিক্রমণ করি।

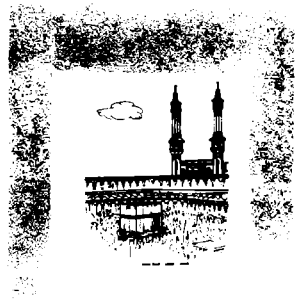

এ পরিক্রমণ কোনো দিন শেষ হবে না।

পারিবারিক গ্রন্থাগার

www.pathagar.com

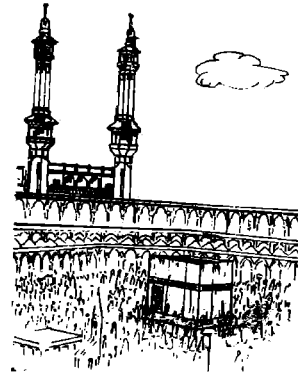

www.pathagar.com

www.pathagar.com

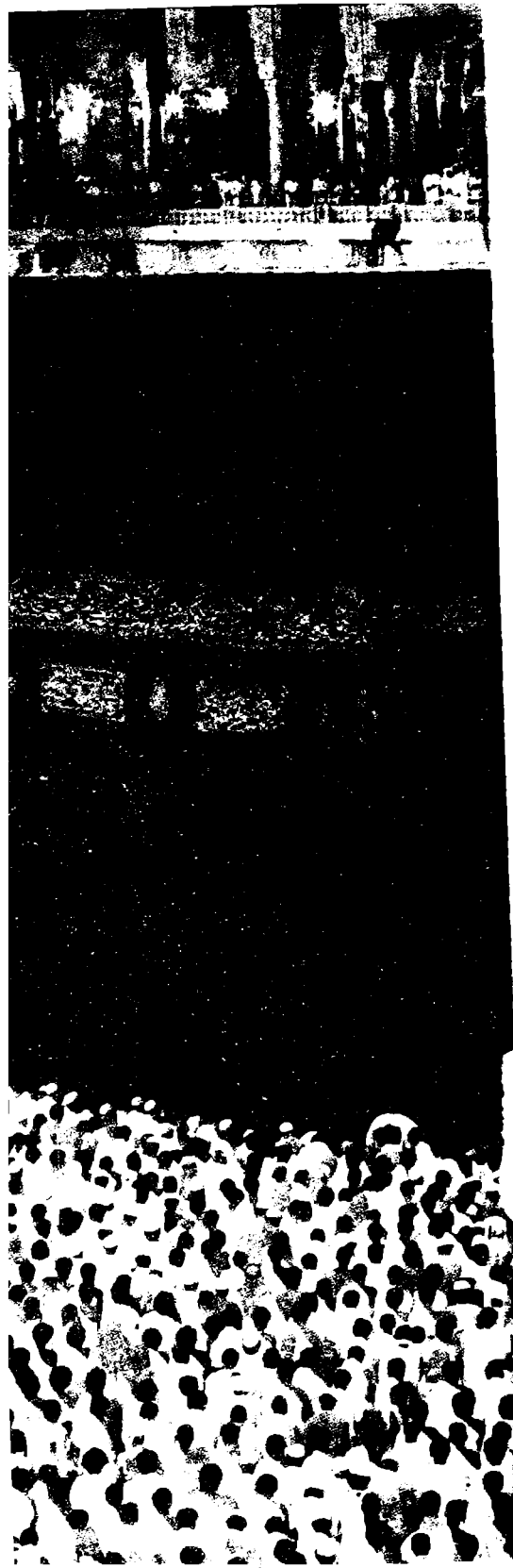

www.pathagar.com